শুকতারা
চতুর্বিংশবর্ষ, দশম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩৭৮
মরণের ডাক!
ওরা উপর দিকে চেয়ে দেখলো!
মিকনেশাস, এরা আদিম মানুষ! এরা নরখাদক! কিন্তু সেলভাজের জঙ্গলে এরা এলো কি করে?
ইকটিনোক, এদের হাত থেকে বাঁচা অসম্ভব! ওদের হাতে বিষতীর! ঈশ্বর ছাড়া কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবেনা!
আদিম সেলভাজ! তার অপার রহস্য আজো অজানা! দুই রেড ইন্ডিয়ান তরুণ আশ্চর্য হলো এই নরখাদকদের দেখতে তাহলে কি মৃত্যুই তাদের নিশ্চিত!!!

ছেলেদের জন্য

[স্ত্রীভূমিকা বর্জিত]

শ্রেষ্ঠ নাটক

নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বিনয় বাদল দীনেশ

দাম—১·২৫

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সব বাঙালী—হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন—যাঁরা আজ ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়—বিনয়, বাদল ও দীনেশ তাঁদের অন্যতম। তাঁদের অমর কাহিনী লেখক এই নাটকে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।)

[পুরুষ ভুমিকা বাজত]

কয়েকখানি নাটক

ঝাণী (অখিল নিয়োগী)	০·৮০
ঝাঁসীর রাণী (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য)	০·৮০
মাটির ঘর (ঐ)	০·৭৫

ছেলেদের জন্য আরও কতকগুলো

[স্ত্রীভূমিকা বর্জিত]

নাটক

বীর মোহনলাল (সুধীন রাহা)	০·৮০
মহারাজ নন্দকুমার (সুধীন রাহা)	১·২৫
বুড়িবালামের তীরে (ঐ)	১·২৫
নেতাজী জিন্দাবাদ (ঐ)	০·৭৫
সিপাহী বিদ্রোহ (বঙ্কিম ঘোষ)	১·২৫
কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখোঃ)	০·৮০
বন্দী বীর (সুনির্ম্মল বসু)	০·৮০
গুরুদক্ষিণা (প্রভাস ঘোষ)	০·৮০
জাগরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য)	০·৭৫
যুগাবতার রামকৃষ্ণ (ঐ)	০·৭৫
বাংলার বিবেক (ঐ)	০·৮০
বিশ বছর আগে (ঐ)	০·৭৫
বিদ্রোহী (যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	০·৮০
কুশধ্বজ (ঐ)	০·৭০
স্বাধীনতা জাগলো (ঐ)	০·৭০
চন্দ্রগুপ্ত (কেশবচন্দ্র সেন)	০·৭৫
কর্ণার্জুন (ঐ)	০·৭৫
বিজয় সিংহ (ঐ)	০·৭৫

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, ২১নং ঝামাপুকুর লেন, কলি-

বাঁটুল দি গ্রেট

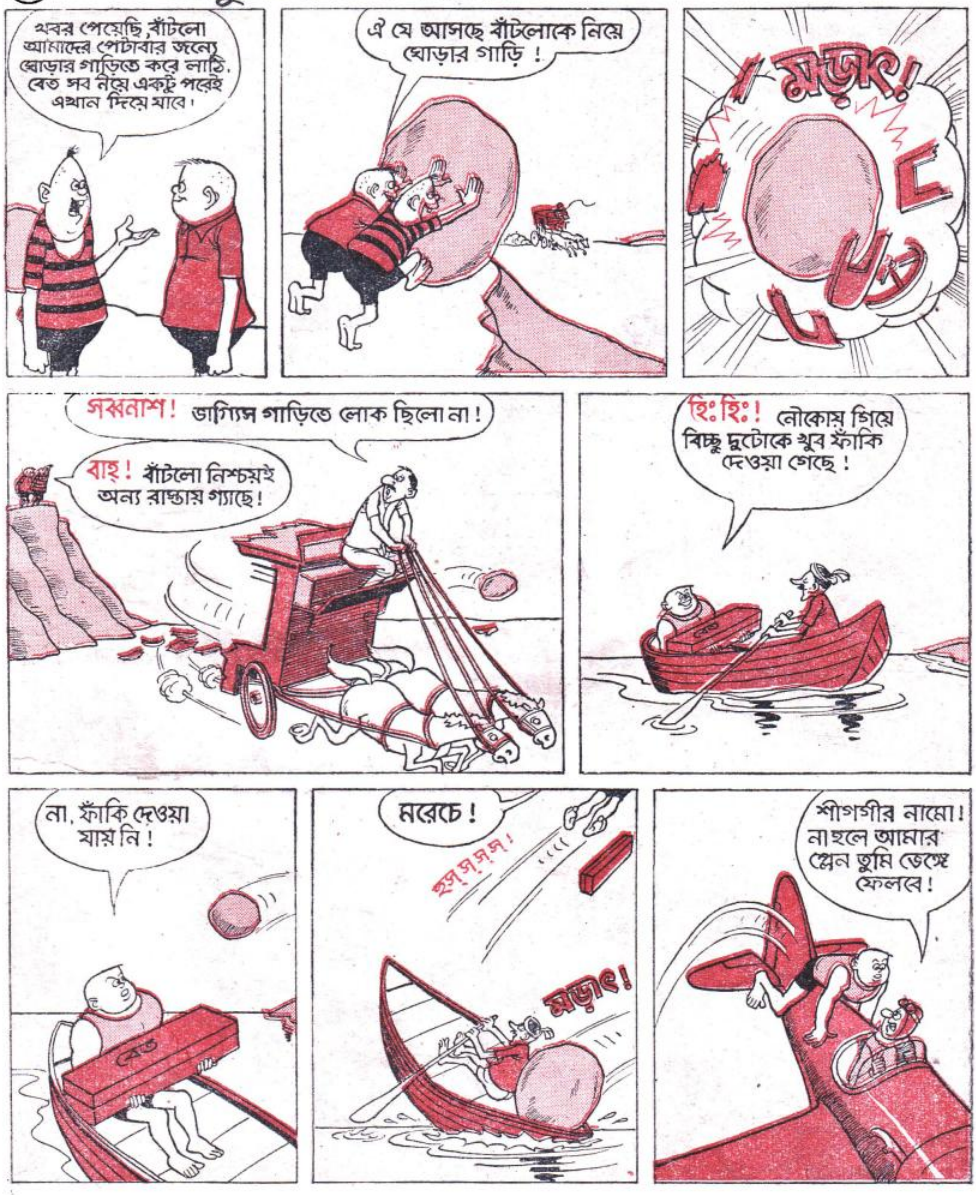
খবর পেয়েছি বাঁটলো আমাদের পেটাবার জন্যে ঘোড়ার গাড়িতে করে লাঠি, বেত সব নিয়ে একটু পরেই এখান দিয়ে যাবে।
ঐ যে আসছে বাঁটলোকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি !
মড়াৎ!
সর্বনাশ! ভাগ্যিস গাড়িতে লোক ছিলো না!
বাহ্! বাঁটলো নিশ্চয়ই অন্য রাস্তায় গ্যাছে!
হিঃ হিঃ! নৌকোয় গিয়ে বিচ্ছু দুটোকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে !
না, ফাঁকি দেওয়া যায় নি !
বেত
মরেচে !
হুড়মুড়!
মড়াৎ!
শীগগীর নামো! না হলে আমার প্লেন তুমি ভেঙ্গে ফেলবে!

নামবো কি করে? আমার প্যারাশুট নেই!
এই নাও, নিয়ে খসে পড়ো!
আঁউ! দিলে প্লেনের ল্যাজ ভেঙে!
সেই সময় নিচে
হিঃ হিঃ! এবারে বাঁটলোকে নির্ঘাত আসমানে উড়িয়ে দিয়েছি!
হোঃ হোঃ! তোদের পিঠের ওপর নামতে দিয়ে খুব উপকার করেছিস!
ধপাস!
ওঁক!
ধাতস্থ হবার পর
চলতো, বাঁটলোটাকে খুঁজে বের করি। তারপর এই মুগুর ওর মুড়োতে ভাঙবো!
ঠিক!
এদিকে
তোমার জন্যেই আমাদের এতো ক্ষতি হলো!
শয়তানগুলোকে রামধোলাই লাগাতে পারো না?
লাগাবার হাতিয়ার যে নেই! কিন্তু—
-আপনারা যদি হাত লাগান তাহলে খুবই উপকার হয়!
বাহ! আমরা যে এখানে আছি বাঁটলোটা তা টের পেয়ে গ্যাছে!
উফ্!
আফ্!
আজই সব
নষ্ট করবেন না। সপ্তাহ
এরকম চালাতে হবে!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971. 2B-20G/71)

সূচীপত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	মরণের ডাক ...	তুষার চ্যাটার্জী ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	জাম্বুবানের বিয়ে (কবিতা) ...	প্রণবকান্তি সিংহ ...	৭০৫
৪।	দেবগিরির দানব (ধারাবাহিক রহস্য-উপন্যাস)	রাজকুমার মৈত্র ...	৭০৬
৫।	বলতে পার ? (মজায় ছবি) ...	— ...	৭১২
৬।	ডানপিটে সতু (গল্প) ...	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ...	৭১৩
৭।	ছাতার জন্মকথা (গল্প) ...	জ্যোতিরীশ গুপ্ত ...	৭১৮
৮।	ম্যানেজ (গল্প) ...	শ্রীজয়দেবকুমার সিংহ ...	৭২২
৯।	আগন্তুক (ছবিতে গল্প) ...	ময়ূখ চৌধুরী ...	৭২৮
১০।	ডম্বলদার বাঘ শিকার (গল্প) ...	কমল লাহিড়ী ...	৭৩০
১১।	দক্ষিণের কামরা (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৭৩৫
১২।	৭১২ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৭৪৮
১৩।	জাঠরাজা সুরজমল (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৭৪৯
১৪।	হাঁদা-ভোঁদার দন্তশূল (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৭৫৬
১৫।	উদ্‌ভ্রান্ত টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৭৫৮
১৬।	সত্য ঘটনা (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	সমীর পাল চৌধুরী ...	৭৬৬
১৭।	প্রতিশোধ (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	সুজাতা সেনগুপ্তা ...	৭৭২
১৮।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৭৭৪
১৯।	"৺সুনির্মল সেনগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৭৭৫

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃত প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

মূল্য ৭০ পয়সা

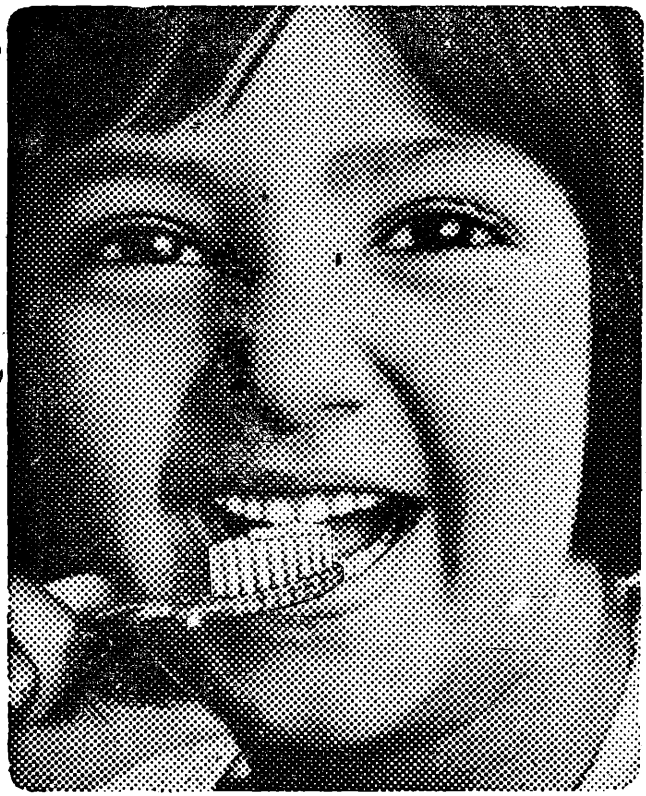

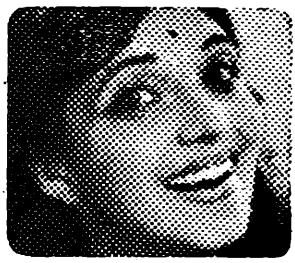

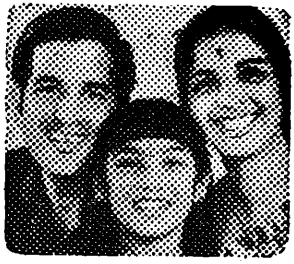

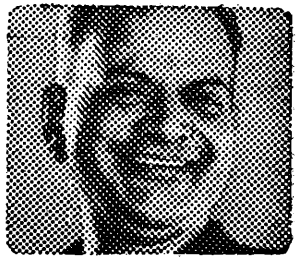

কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন... সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

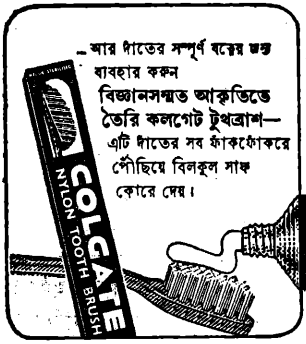

—আর দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন
বিজ্ঞানসম্মত আকৃতিতে তৈরি কলগেট টুথব্রাশ—এটি দাঁতের সব ফাঁকফোকরে পৌঁছিয়ে বিলকুল সাফ কোরে দেয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পদ্ধায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়। একমাত্র কলগেট তার প্রমাণ দিতে পারে। সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালোবাসে।

মধুর স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুভ্র উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট।

DC G.41 BN

চতুর্বিংশ বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা ❀ ১৩৭৮, অগ্রহায়ণ

জাম্বুমানের বিয়ে

প্রণবকান্তি সিংহ

জম্বুদ্বীপে ধুম পড়েছে
জাম্বুবানের বিয়ে।
বানর ভায়া ভাজছে লুচি,
তপ্ত গাওয়া ঘিয়ে।
ট্যাক্সি আনে শেয়াল মামা—
টুকটুকে লাল গায়ে জামা
পাঁজি হ তে পুরুত আসে
শ্যাওড়াতলা দিয়ে।

আজকে কনের গায়ে হলুদ,
কালকে কনের বিয়ে।
ট্যাক্সি চড়ে বর এসেছে
টোপর মাথায় দিয়ে॥

হনুমানে ঢোলক ব জায়,
ওরাং ওটাং কলকে সাজায়,
রঙ্গ করে বরের সাথে বনমানুষের ঝিয়ে।

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৮

হায়দ্রাবাদে যা ঘটেছিল তার জের সেইখানেই যদি শেষ হত তাহলে কলকাতার বেলেঘাটায় সেদিন রাত্রে অমন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটত না।

বেলেঘাটায় রমাশঙ্করবাবুর পৈতৃক ভিটে। বাড়িটা বহু পুরানো আমলের। শোনা যায় এক কালে বাড়িটা নাকি কোন এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের বাগানবাড়ি ছিল।

প্রায় আড়াই বিঘে জমির ওপর বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গেচুরে বালি চুন খসে পড়ে ভুতুড়ে বাড়ির আকার নিয়েছে।

ঐ বাড়িতে মণিশঙ্করও থাকত না। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পিকনিক করতে যেত। বাড়িটার চারপাশে মস্ত বাগান। বাগানে সবজি লাগান হয়েছে। একজন মাইনে করা উড়িয়া মালী থাকে, দেখাশোনা করে।

কলকাতায় ফিরে রমাশঙ্করবাবু কিছুতেই মণিশঙ্করের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকলেন না। নিজের পৈত্রিক ভিটেতে থাকবেন মনস্থ করলেন।

প্রফেসর সেন বাড়িটা দেখেশুনে বললেন,—আপনার এ বাড়ির ঠিকানা সংগ্রাম সিং জানে?

—না। তার জানবার কথা নয়। তবে স্বয়ং নিজামবাহাদুর জানেন।

—নিজামবাহাদুর জানলে ক্ষতি নেই কিন্তু তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জানলে সংগ্রাম সিংহ খোঁজ পেতে পারে।

রমাশঙ্করবাবু চিন্তিত হলেন।

প্রফেসর সেন বললেন,—অবশ্য আপনি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকলে যে সংগ্রাম সিং খোঁজ পাবে না এমন কথা আমি হলপ করে বলতে পারি না। সে যে ধরনের লোক শুনলাম তাতে সহজে সে হাল ছেড়ে দেবে বলে তো মনে হয় না। তাকে আসতেই হবে।

রমাশঙ্করবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন,—তাহলে আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকাই সবচেয়ে সেফ।

—হয়তো বা। কিন্তু আপনাকে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকতে আমি বলবো না। তার চেয়ে এই বাড়িতে থাকা ভাল। আপনাদের কার কি মত আমি জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, শত্রুপক্ষকে কখনই একটা বিশেষ বাড়ির ওপর নজর রাখার সুযোগ দিতে নেই। আমি যেখানে থাকি, সুরেশ সেখানে থাকে না। আবার আপনি যেখানে থাকেন সেখানে মণিশঙ্কর কিংবা ভ্রমর সিং সেখানে থাকে না। অথচ আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সব সময় আছে এবং থাকবে। একজন আক্রান্ত হলে যাতে বাইরে থেকে আমরা বাকি চারজনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আমার মনে হয় এইটেতেই আমাদের বেশী সুবিধে।

মণিশঙ্কর বললে,—কিন্তু আমাকে কাকামণির সঙ্গে থাকতেই হবে। একা সমরুর ওপর এ দেশে নির্ভর করা ঠিক নয়। যা দিনকাল পড়েছে। এ পাড়ার সবাই আমাকে ভালরকম চেনে। আমার একটা ডাকে পাঁচটা লোক ছুটে আসবে।

রমাশঙ্করবাবুর তাতে মোটেই আপত্তি ছিল না। মণিশঙ্করকে ছেড়ে তিনি তো থাকতে চাইছিলেন না।

* * * *

প্রফেসর ত্রিদিব সেন একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক। রমাশঙ্করবাবু না চাইলেও তিনি কোন মতে বিখ্যাত সেই শিলালিপিটি ফেলে আসেন নি। সেটা যত্ন করে নিয়ে এসে জাদুঘরে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে রেখে দিয়েছিলেন।

রোজই এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে রমাশঙ্করবাবুর আলোচনা হয়। শিলার ওপর খোদাই করা সাংকেতিক ভাষা কিভাবে বিকৃত করেছেন দেখালেন। কি ছিল আর কি করা হয়েছে।

তারপর শুরু হল গভীর আলোচনা। ইতিহাসকে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে ওঁরা দুজনে পোস্টমর্টেম করতে লাগলেন। সুলতানা ফিরোজ শাহ, আহম্মদ শাহ, আসমানী বেগম আর সেই পার্শ্বচরটি যার নাম ইতিহাস মনে রাখেনি—এই চারজনকে নিয়ে চুলচেরা বিচার হল।

দেখা গেল আসমানী বেগম ছিলেন পারস্য দেশের কোন এক সুলতানের হারেমে। সেখান থেকে কি করে কেমন করে তিনি বাহমনী রাজ্যে এলেন কেউ জানে না।

এইটুকু উদ্ধার করতে পারলেই আমাদের ম্যাপ পূর্ণ হবে। [পৃষ্ঠা ৭০৯

আসমানী বেগম পারস্যের নারী। তাই তাঁর সাংকেতিক ভাষা জানা খুব স্বাভাবিক। শিলায় যে ভাষা আছে তার সঙ্গে পারস্য দেশের ভাষার কিছু মিল আছে।

রমাশঙ্করবাবু সাংকেতিক ভাষার অর্থ করলেন এইভাবে···

পর্বত যেখানে শুরু আর যেখানে শেষ।
চারের এক সেইখানেই শুরু কর।
যে ভাগ্যবান, তাকে বলি মন দিয়ে শোন,
অন্ধকারে কানা গলি ধরে চলতে শুরু কর।
খোদা যেখানে শেষ সীমানা টেনেছেন
ঠিক তারই নীচে আছে মূর্খের কবর।

যদি তুমি বুদ্ধিমান হও তবে রাজ্য ছেড়ে
আমার আঁকা চিহ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে
সুলতানের অনুগামী হও। রত্ন সিংহাসন তোমারই।···বেগম

রমাশঙ্করবাবু সাংকেতিক ভাষার অর্থ করে শোনাতে প্রফেসর সেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। রমাশঙ্করবাবু বললেন,—এই কটি কথার মধ্যে আসমানী বেগম একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছেন লক্ষ্য করেছেন।

প্রফেসর সেন হাঁ না কোন-উত্তর দিলেন না।

রমাশঙ্করবাবু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন,—কি বুঝতে পারছেন না?

প্রফেসর সেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন,—কিছুটা নিশ্চয়ই বুঝেছি কিন্তু আমার মনে হয় আপনি সব কথা পরিষ্কার করে বলেন নি। আরও আছে—

রমাশঙ্করবাবু হেসে বললেন,—আছে আছে আরও আছে। আমি সবটা বুঝিনি তাই আপনাকে বলিও নি। এইটুকু উদ্ধার করতে পারলেই আমাদের ম্যাপ পূর্ণ হবে।

—তার মানে আপনি এখনও চিহ্নগুলো পর পর সাজিয়ে নিতে পারেন নি।

—ঠিক বলেছেন। এই চিহ্নগুলো পর পর সাজান বড় কঠিন। আমি জানতে চাই এই চিহ্নগুলোর বিশেষ কোন অর্থ আছে কি না।

—দেখি আসল চিহ্নগুলো কি রকম।

—এই দেখুন।

রমাশঙ্কর তাঁর ডায়েরীর প্রত্যেক পাতার নীচে এক একটা চিহ্ন এঁকে রেখেছিলেন। সেগুলো পর পর সাজালে এই রকম দেখায়—

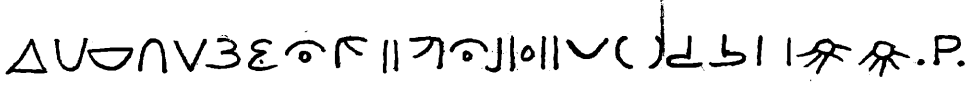

প্রফেসর সেন গভীর মনোযোগ দিয়ে চিহ্নগুলো দেখতে দেখতে এক সময় বলে উঠলেন,—রমাশঙ্করবাবু আমার মনে হচ্ছে বেগমসাহেবার মনোভাব আমি কিছুটা বুঝে ছি।

—বুঝেছেন ?

—হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা আপনি তো ইতিহাস পড়েছেন। বলতে পারেন আসমানী বেগম কি শিল্পের অনুরাগী ছিলেন ?

রমাশঙ্কর বললেন,—আসমানী বেগম সম্বন্ধে ঠিক তেমন কোন কথা লেখা নেই। তবে নিকিতিনের বিবরণে আছে সুলতান ফিরোজ শাহ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের মর্যাদা ছিল।

—ঐটুকুই যথেষ্ট। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। রমাশঙ্করবাবু, আপনি ম্যাপ এঁকে ফেলুন, স্পটে গিয়ে এই চিহ্নগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলতে আমাদের বেগ পেতে হবে না।

প্রফেসর সেন আর বিশেষ কিছু বলতে চাইলেন না। একটা কাগজে চিহ্নগুলো এঁকে নিয়ে ফিরে গেলেন।

*　　*　　*

রমাশঙ্করবাবুর বাড়িতে টেলিফোন ছিল না।

অগত্যা মণিশঙ্কর তার ভাড়া বাড়ি থেকে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল। টেলিফোন কোম্পানি যেদিন টেলিফোন দিয়ে গেল সেদিনই টেলিফোনটা রাত একটা নাগাদ ঝনঝন করে বেজে উঠল।

মণিশঙ্কর রাত দশটার পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে ছিলেন শুধু রমাশঙ্করবাবু। প্রফেসর সেনের কথামত তিনি ম্যাপটা কাগজে এঁকে ফেলছিলেন। সব কাজ শেষ করেছেন এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোন বেজে উঠতে রমাশঙ্করবাবু রিসিভার তুললেন।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন ?

ওপাশ থেকে একটি নারীকণ্ঠ ধ্বনি তুলল,—আচ্ছা এটা কি মণিশঙ্কর চাটুয্যের বাড়ি ?

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—হ্যাঁ। আপনার নাম ?

—নীনা সরখেল্। আচ্ছা আপনি মণিশঙ্করের কে হন ?

—আমি তার কাকা।

—ও আপনার নাম বুঝি রমাশঙ্করবাবু—

—হ্যাঁ। তোমার নাম যদি নীনা সরখেল হয় তবে তুমি তো আমাকে ভাল করেই চেন।

—হ্যাঁ চিনি, সেই জন্যেই তো আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা জানতে চাইছি।

—কেন ? কি দরকার !

—আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কি ব্যাপারে বল ?

—সে কথা টেলিফোনে বলা যায় না। আপনার সামনে আমি মণিশঙ্করকে বলবো। কাল সকালেই যাব। আমার সঙ্গে কেউ থাকবে না। আমি একা যাব।

—বেশ তো আমার আপত্তি নেই।

—তাহলে দয়া করে ঠিকানাটা বলুন।

রমাশঙ্করবাবু ঠিকানাটা বলে দিতেই নীনা সরখেল বললে,—এইবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন।

মনে হল মেয়েটি অন্য কাউকে রিসিভার ছেড়ে দিল। কেন না পরক্ষণে ভেসে এল এক পুরুষ কণ্ঠ।

—নমস্কার বাবুজী, আমাকে চিনতে পারছেন—

—কে ?

রমাশঙ্করবাবু আঁতকে উঠলেন। হাত কেঁপে উঠল।

পাশের পুরুষ কণ্ঠ হেসে ওঠে—কি হল বাবুজী আঁতকে উঠলে কেন ? তোমার কি ধারণা আমি কবরের নীচে থেকে কথা বলছি।

—তুমি—

—হ্যাঁ আমি বেঁচে আছি। বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি জান ? না আর কোন সুযোগ

তুমি পাবে না! নীনা তোমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেও আমি তোমার ঠিকানা আগে থেকে জানতাম। আর এতক্ষণ বোধহয় লোকজন নিয়ে ডাক্তারবাবু তোমার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যে রওনা হয়ে গেছে। আমি কাপুরুষের মত যুদ্ধ করি না তাই আগে থাকতে তোমাকে জানিয়ে দিলাম। গুড নাইট্—

লাইন কেটে দিল সংগ্রাম সিং।

রমাশঙ্করবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তখুনি প্রফেসর সেনকে টেলিফোন করলেন,—হ্যালো প্রফেসর। শুনুন এইমাত্র সংগ্রাম সিং টেলিফোন করেছিল! সে দলবল নিয়ে আসছে—না না এসে পড়েছে। ঐ শুনুন দরজায় লাথি মারছে। পুরানো দরজা এক্ষুণি ভেঙে পড়বে।

পিস্তল নিয়ে···গুলি চালাতে লাগলেন। [পৃষ্ঠা ৭১১

প্রফেসর সেন বললেন,—আপনি ভয় পাবেন না আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। খুব জোর কুড়ি মিনিট—যুদ্ধ চালিয়ে যান।

রমাশঙ্করবাবু রিসিভার ছেড়ে দিলেন। ইতিমধ্যে মণিশঙ্কর আর সমরুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সদর দরজায় ঘা পড়ছে। সমরু ভাবল তাদেরই কেউ এসেছে। ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

সেই সময় রমাশঙ্করবাবু চিৎকার করে উঠলেন,—মণি, দরজা খুলতে নিষেধ কর। ওরা সংগ্রাম সিংয়ের লোক।

তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। সমরুকে ওরা সামনে পেয়েই খুন করল। রমাশঙ্করবাবু মণির ঘরের দিকে যেতে গিয়ে পারলেন না। মণির সঙ্গে তখন ওদের রীতিমত গুলি বিনিময় শুরু হয়ে গেছে। ওরা সংখ্যায় ছিল চারজন।

রমাশঙ্করবাবু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে পিস্তল নিয়ে এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগলেন।

এই সময় মণিশঙ্কর চিৎকার করে বললে,—কাকামণি আপনি পালান, আমি এদের আটকে রাখছি।

কথাটা বলতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল সে। আর তারই ফলে একটা বুলেট এসে লাগল তার দেহে। মণিশঙ্কর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

রমাশঙ্করবাবু বুঝলেন একমাত্র পালানো ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। বুদ্ধি করে তাই তিনি বাথরুমের মধ্যে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। শত্রুপক্ষ চড়াও হল। তারা বাথরুমের দিকে যাবার আগেই রমাশঙ্করবাবু বাথরুমের ভাঙা জানলা টপকে বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হলেন।

এই বিপদের মধ্যেও রমাশঙ্করবাবু ম্যাপটার কথা ভোলেন নি। বাথরুমে পালাবার আগে ম্যাপ সমেত ডায়েরীটা নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুলির আওয়াজে পাড়ার লোকেরা জেগে উঠেছিল। রমাশঙ্করবাবু বাগানের পাঁচিল টপকে পথে পড়তেই পোস্ট অফিসের লাল রঙের লেটার বক্সের ওপর নজর পড়ল। চট্ করে মগজে বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাড়াতাড়ি ম্যাপটা আর ডায়েরীটা লেটার বক্সে পোস্ট করে দিলেন।

এর পরের ঘটনা কাহিনীর শুরুতেই জানিয়েছি। প্রফেসর সেন এসে রমাশঙ্করবাবুকে অপমৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে।

(ক্রমশঃ)

বলতে পার ?

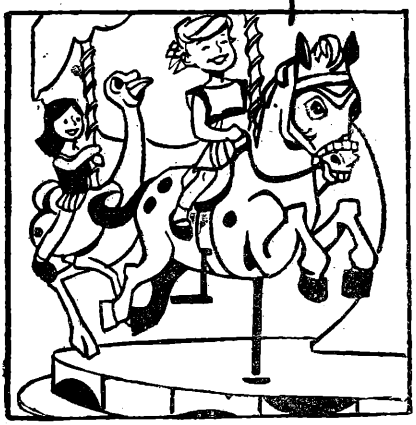

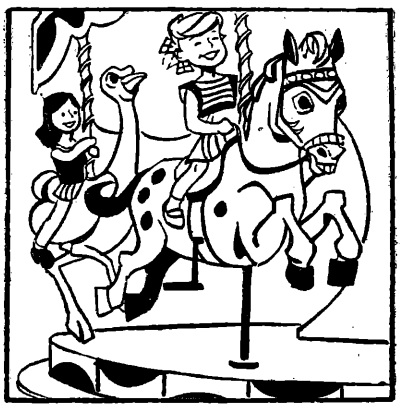

(না পারলে ৭১২ পৃষ্ঠায় দেখ)

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সতুর খুব নাম।

ডানপিটে ছেলে। যেমন সাহস, তেমনি গায়ের জোর। স্কুলের বন্ধু-বান্ধব, পাড়ার ছেলেমেয়ে সতু বলতে অজ্ঞান। স্কুলে ফুটবল খেলার ম্যাচ হবে, ডাক পড়ল সতুর। খেলা বেশ জমে উঠেছে, দুই দলেই সমান খেলছে। হঠাৎ সতুরা গোল খেয়ে বসল। ব্যস আর দেখতে হলো না। সতু গেল ক্ষেপে। তার পায়ের রক্ত মাথায় গিয়ে উঠল। তারপর যা হলো, তাকে আর খেলা বলা চলে না। সতু একাই একশ হয়ে উঠল। তার কাছে থেকে যে বল কেড়ে নিতে যাবে, হয় তার পা ভাঙ্গবে, নয়তো মাথা ফাটবে। খেলার মাঠে হইহই কাণ্ড। খেলা যায় বন্ধ হয়ে। শুরু হবে তার পরিবর্তে মার আর দাঙ্গা।

পাড়ায় পাড়ায় কালীপূজোর চাঁদা নিয়ে লেগে গেল দাঙ্গা। ডাক এলো সতুর। সতু যে পক্ষে যোগ দেবে, সেই পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সেই সতু এসেছে মামাবাড়ি, পূজোর ছুটি উপলক্ষে। অজ পাড়াগাঁ। ঝোপ-জঙ্গল, ডোবা-পুকুরে ভর্তি। সতু প্রায়ই আসে মামাবাড়ি। স্কুল ছুটি হলেই হল।

গাঁয়ে তিনটে পাড়া—ঘোষ-পাড়া, পাল-পাড়া আর যুগীপাড়া। মামারা হলো ঘোষ। অবস্থা ভাল। বার মাস পূজো-পার্বণ লেগেই থাকে। দোল, যাত্রা, থিয়েটার এও মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু এবার মামাবাড়ি এসে সতু দেখে পূজো এসে গেছে কিন্তু কারো কোন উৎসাহ নেই। সবাই কেমন যেন নিঝুম!

খাওয়া-দাওয়া করে সতু ছুটল পালেদের বাড়ি। পালেদের ছেলে ভেণ্টুর সঙ্গে ওর খুব ভাব। যখনই সে মামাবাড়ি আসে পালেদের বাড়ি তার যাওয়া চাই।

ঘোষ পাড়ার মতন, পালপাড়ায়ও দুর্গাপূজো হয়। এই দুই পূজো নিয়ে সারা গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো মেতে ওঠে। ভেণ্টুদের বাড়ি এসে সতু অবাক্ হলো! এ বাড়ির লোকেরাও ম্রিয়মাণ। পূজো এসে গেছে, কিন্তু কারো তাতে উৎসাহ নেই।

ভেণ্টুকে সে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কিরে ভেণ্টু। এবার যেন কেমন কেমন লাগছে। পূজো এসে গেছে, কিন্তু কারো ভিতর উৎসাহ নেই। সকলের মুখে আতঙ্ক।"

ভেণ্টুর মুখে বিষাদের হাসি। বলল, "তুমি ভাই শহুরে মানুষ। গ্রামের অবস্থা তো জান না। আমরা দুমাস ধরে খুব বিপদের মধ্যে বাস করছি।"

সতু বলল, "কি বিপদ হলো? নকশালরা হামলা চালাচ্ছে নাকি। না কম্যুনিস্টদের উৎপাত শুরু হয়েছে।"

ভেণ্টু বলল, "না-না, তা হলে তো ভালই হতো। আমরা দল বেঁধে তাদের প্রতিরোধ করতাম।"

সতু বলল, "তবে কাদের ভয়ে তোরা মরছিস্?"

ভেণ্টু বলল, "ভূতের! আজ দুমাস হলো ভূতের উৎপাত চলছে। রাত হলে বিশ্রী সুরে কারা কাঁদে। পাড়ায় আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ির উপর ইঁট-পাটকেল, গরুর হাড়, মানুষের মাথা এসে পড়ে। সন্ধ্যা হলে গ্রামের মানুষ ভয়ে ঘরের বার হয় না।

সতু বলল, "ভূত দেখেছিস্ তোরা?"

ভেণ্টু বলল, "না, কিন্তু কেউ কেউ দেখেছে। কয়েক দিন আগে পটলা মুদী ভূতের সামনে পড়ে গিয়েছিল। ভূত বলল, 'পটলা রে, আজ তোকে খাব?' পটলা সেদিন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এলো, তারপরই জ্বর। একমাস জ্বরে ভুগে তবে সে সুস্থ হয়ে উঠল।"

সতু বলল, "এর প্রতিকার করিস্ নে কেন?"

ভেণ্টু বলল, "প্রতিকার হয়। যে বাড়িতে ভূত ভর করে, হাড়গোড় ফেলে, তারা রামঠাকুরকে ডেকে এনে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে। লোকটা গরিব বটে, পূজো করে ভাল। সে বাড়িতে আর ভূতের উপদ্রব হয় না। তাই আজকাল রামঠাকুরের খুব কদর। খুব নামডাক হয়েছে। জানিস্ সতু কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। রামঠাকুর আগে খেতে পেতো না, এখন দুধ ভাত খাচ্ছে। কিন্তু লোকটার মন্ত্রের জোর আছে। যে বাড়িতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে দেবে সেই বাড়ির ত্রিসীমায় ভূত যায় না।"

চারিদিকের খবর নিয়ে সতু দেখল, সকলের মুখে একই কথা, ভূতের উৎপাত বন্ধ করতে রামঠাকুরের জুড়ি নেই। কিন্তু হঠাৎ ভূতের অত্যাচার বন্ধ হল কেন? আজ সাত দিন সতু এসেছে—এই সাত দিনে ভূতের টিকিরও দেখা নেই।

মামীমা বললেন, "তোর ভয়ে ভূত পালিয়েছে। নইলে এত দিন, আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়িতে ভূতেরা হানা দিত।"

শুনে সতু চুপ করে থাকে। সকলেই ওকে নিয়ে একটু বিদ্রূপ করে। সতু কথা কয় না।

সতু টর্চ জ্বালিয়ে সব দেখছিল। [পৃষ্ঠা ৭১৬

আজ ঘোর অমাবস্যা। গ্রামের প্রত্যেক মানুষের বুক দুরদুর করছে। সন্ধ্যা হবার আগেই লোকেরা ঘরে গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে বসেছে। মুদীও তার দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। সতুর মামারা ঘরে এসে গেছে। জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভূতের আলোচনা করছে। ছেলেরা মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়াশুনা করছে। কাছারি ঘরের লোকজনরা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে রান্না হচ্ছে। দারোয়ানরা বাইরের ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছে।

রাত তখন বেশী হয় নি। সবে আটটা। এমন সময় কে বিশ্রী সুরে কেঁদে উঠল। বাড়িসুদ্ধ মানুষ ভয়ে কুঁকড়ে গেল। দারোয়ানরা রামায়ণ পড়া বন্ধ করে কাছারি ঘরে গিয়ে ঢুকল। যে রান্না করছিল, সে ভয়ে চিৎকার করছে। এ কান্নার অর্থ সবাই জানে, এ কান্না হল শাঁকচুন্নীর। এই বাড়িতে এই প্রথম। এর পরই শুরু হবে, হাড়গোড় মড়ার মাথা। বাড়িসুদ্ধ লোক ভয়ে কাঁপছে। মেয়েরা দুর্গা নাম জপ করছে।

ঘণ্টাখানেক এভাবে কান্নার পর দুপদাপ পাথর বৃষ্টি হল। তারপরই পড়তে লাগল মড়ার হাড়। ছেলেদের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে আছে তারা। মেয়েদের চলৎ-

শক্তি রহিত। বুড়োরা ঘরে বসে হুমকি দিচ্ছে। সতু এই সুযোগে চুপি চুপি ঘর থেকে বার হচ্ছিল। মামারা দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে উঠল, "এই সতে কোথা যাচ্ছিস্? বসে থাক।"

সতু বলল, "এখনি আসছি।" বলে কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল।

বাইরে এসে সতু দেখে, উঠানময় পাথর ও মড়ার হাড় এখানে ওখানে পড়ে আছে। শাকচুন্নীর কান্নাটাও ভেসে আসছে থেকে থেকে।

অমাবস্যার রাত্রি। চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। সতু টর্চ জ্বালিয়ে সব দেখছিল। এমন সময় দুম করে একটা মড়ার মাথা এসে পড়ল সতুর পায়ের কাছে। চট করে টর্চ নিভিয়ে দিল সতু। মামা বাড়ির পশ্চিম দিকে, পাঁচিলের গা থেকে বিরাট জঙ্গল। কান্না ও মড়ার হাড়গোড় সব ঐ দিক থেকে আসছে।

সতু চুপিচুপি দরজা বন্ধ করে বের হয়ে পড়ল। পথঘাট নির্জন। তার উপর অন্ধকার। ঝিমিয়ে আছে গ্রামখানা। কোথায়ও একটু সাড়াশব্দ নেই। কেবল শাঁকচুন্নীর সেই ককিয়ে ককিয়ে কান্না এই নীরব, নিস্তব্ধ পল্লীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ক্ষণিকের জন্য সতুর বুকটা কেঁপে উঠল। সে অনেক বীরত্বের কাজ করেছে, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সে কোনদিন পড়েনি। কিন্তু একবার যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়েছে, আর ফিরে যাওয়া যায় না। যা থাকে কপালে সে দেখবে, কে এমন করে কাঁদছে, কেই বা মড়ার হাড় ছুড়ছে।

টর্চ হাতে করে সতু এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের কাছাকাছি এসে টর্চ জ্বালল। এখানে অন্ধকার আরো গাঢ়। ঝিঁঝি ডাকছে। টর্চ জ্বালিয়ে ভাল করে দেখে নিল সতু। রাস্তা দিয়ে ছোট একটা পথের রেখা গেছে মামাবাড়ির প্রাচীরের কাছে। সতু সেই পথ দিয়েই জঙ্গলে প্রবেশ করল। মামাবাড়ির পাঁচিলের কাছে এসেই সতু চমকে উঠল। কালো আলখাল্লা পড়া একটা লোক তার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে আর পাথর ছুড়ছে। লোকটা পেছন ফিরে থাকায় সতুর হাতের টর্চের আলো সে টের পায় নি। সতু টর্চের আলো নিবিয়ে লোকটার পেছনে এসে দাঁড়াল। লোকটা আপন মনে ঢিল ছুড়ছে আর ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠছে। প্রথমটায় সতুর বুক একটু কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য, তারপরই লোকটার ঘাড় চেপে ধরল সতু।

আচমকা আক্রমণে লোকটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সতু টর্চ জ্বালাল। ভেবেছিল লোকটা তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করবে। কিন্তু লোকটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল। লোকটার মুখেও মুখোশ। দেখলেই ভয় হয়।

সতু বলল, "কে তুই।"

•• লোকটা কথা বলে না। সতু একটানে মুখোশটা খুলে নিল। সতুই হেসে উঠল, "ক্যাবলা তুই। তোর এই কাজ।" ক্যাবলা সতুরই সমানবয়সী। যুগীপাড়ার হারান যুগীর ছেলে।

—"হ কর্তা।"

—"তোকে আজ মেরেই ফেলব হারামজাদা। তুই সারা গ্রামটাকে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছিস্।" বলে তাকে হিড়হিড় করে জঙ্গল থেকে টেনে বার করে নিয়ে এলো।

ক্যাবলা হাত জোড় করে বলল, "মোর দোষ নেই কর্তা।"

সতু বলল, "তবে কার দোষ।"

ক্যাবলা বলল, "রাম ঠাকুরের। উনি আমাকে ভূত সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। যে যে বাড়িতে উৎপাত করতে বলে দেন, আমি সেই সমস্ত বাড়িতে উৎপাত করি।"

সতু বলল, "এতে তোর লাভ?"

আচমকা আক্রমণে লোকটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। [পৃষ্ঠা ৭১৬

—"বারে! উনি যে আমাকে একটি করে টাকা দেন। দিয়েই সাবধান করে দেন। যে সব বাড়িতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে দিয়েছেন, সেই সব বাড়িতে যেন হামলা না করি!"

সতু মামা মামীদের ডেকে ভূত দেখিয়ে দিল। ক্যাবলার কাণ্ড শুনে সবাই অবাক্। পরদিন রামঠাকুরকে ডেকে আনা হল। ক্যাবলা তার সামনে সকল কথা স্বীকার করল। রামঠাকুরও অপরাধ মেনে নিলো। সকলে তাকে ছিঃ ছিঃ করল। ছেলেরা মারতে গেল। সতু বাধা দিল। রামঠাকুরকে সাবধান করে দিয়ে ছেড়ে দিল। সেই যে ভূতের উৎপাত বন্ধ হল তা আর কখনও হয় নি। সতুর নাম গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল।

ছাতার জন্মকথা

জ্যোতিরীশ গুপ্ত

সেদিন বিকেল হতেই ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি এলো। তার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল বিলু। রান্নাঘর থেকে মা হেঁকে বললেন, 'বিলু কোথায় রে। জামাটা গায়ে গলিয়ে নে। যা বিষ্টি, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

বিলুর খেয়াল নেই। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাইরে। সামনের রাস্তায় তখন লোকজনের ছুটোছুটি। হাটুরেরা মালপত্তর নিয়ে যে যার ঢুকে পড়ছে রাস্তার পাশে দোকান-গুলোতে। একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। গরুগুলো ভিজছে। বাসরাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে কতকগুলো তার এসেছে বাড়ির ছাতে। ইলেক্‌ট্রিকের তার। বিলু জানে, এই তারগুলো দিয়েই বিদ্যুৎ আসে, আলো জ্বালে তাদের ঘরে। আমগাছের ডালগুলো দমকা হাওয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারগুলোর উপর। তারগুলো এখন ভীষণ নড়ছে। সুপুরি গাছগুলো ভীষণ জোরে জোরে দুলছে। বাতাবি লেবু গাছটায় একটা কাক বসে বসে ভিজছে। ভোঁ ভোঁ করতে করতে রিকশাগুলো ছুটে পালাচ্ছে। বাসগুলো ছুটছে বিদ্যুৎগতিতে। বৃষ্টির দিনগুলোতে বিলুর ভারী মজা। এক মনে তাকিয়ে আছে বাইরে। মার কথাগুলো কানেই যায়নি যেন।

হঠাৎ—একেবারে হঠাৎ চিরচির করে আগুন ধরল তারে।

বিলু দেখল, ঘরের আলোগুলো দপ্ করে নিভে গেছে। রেডিওতে একটি মেয়ে সুরেলা কণ্ঠে গান করছিল। কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে। গান থেমে গেছে। এখন চারিদিক নিস্তব্ধ আর অন্ধকার। বিলুর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এবার ঠাকুরমা ডাকলেন। হ্যারিকেনের আলো জ্বাললেন। বিলুকে পড়তে বসতে হবে। ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে বিলুর। হ্যারিকেনের আলোতে পড়তে ইচ্ছে হয় না। তার উপর এই বাদলা সন্ধ্যা। ঠাকুরমার আঁচল ধরে বিলু বলল, 'আজ আর পড়ব না ঠাকুরমা। পড়তে ইচ্ছে করছে না। একটা গল্প বল।'

কোলের কাছটিতে টেনে নিয়ে ঠাকুরমা বিলুর গায়ে জামা পরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'কি গল্প বলব, বল।' বিলু বলল, 'রাক্ষস-খোক্কস রাজপুত্তুরের গল্প।'

এমন সময় ছাতা বন্ধ করে বিলুর বাবা ঢুকলেন ঘরে। হাট করে ফিরেছেন তিনি। ঘরের বাইরে দোরগোড়ায় ছাতা রাখতে রাখতে বললেন, 'উঃ, কী বৃষ্টি! ভাগ্যিস্ ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিলুম। আকাশ কালো হতেই বুঝেছিলুম, জোর বৃষ্টি হবে।'

বাবা পাশের ঘরে যেতেই বিলু ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাল। ঠাকুরমা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ভিজে ছাতাটার দিকে। ছাতার ডগা বেয়ে জল ঝরছে। ঠাকুরমা কি তাই দেখছেন? এতে দেখবার কি আছে? বিলু অধৈর্য হয়ে বলল, 'ঠাকুরমা, গল্প বল।'

বলি তবে, শোন।— ঠাকুরমা শুরু করলেন গল্প। বহুকাল আগে আসামের চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে একটি ছোট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজার নাম ছিল মেঘবর্মা। তাঁর রাজ্যে দিনরাত বৃষ্টি হত। বৃষ্টির জন্যে প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। ছাতা বা রেন-কোটের প্রচলন তখনও হয়নি। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তারা কাজ করত। আর সারা বছরই সর্দি-কাশি-জ্বরে ভুগত। বাড়িতে বসে থাকারও উপায় ছিল না। দিনরাত ভনভন করত মশা। দিনের বেলাতেও মশারি টাঙ্গিয়ে থাকতে হত। গল্পগুজব সবই মশারির ভিতর। রাজামশাই তো মশারির বাইরে বেরুতেনই না। মশারির ভিতরেই শুয়ে বসে কাটাতেন। রাজসভাও বসত মশারির ভিতর। বিরাট মশারির মধ্যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসতেন রাজা। চারিদিকে ঘিরে বসত মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজকর্মচারীরা। মশারির চারিদিকে দল বেঁধে মশারা ভনভন করে ঘুরে বেড়াত। বিরাট বিরাট মশা। তাদের এক এক কামড়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠত। সেই ভয়ে রাজা মশারি ছেড়ে বেরুতেনই না। কিন্তু প্রজাদের না বেরুলে তো চলত না। না বেরুলে খাবে কি? রাজা কিন্তু প্রজাদের

বিলু বলল, 'রাক্ষস-খোক্কস রাজপুত্তুরের গল্প?' [পৃষ্ঠা ৭১৮

দুঃখ বুঝতেন না। তারা বৃষ্টিতে ভিজুক কি জ্বরেই কষ্ট পাক তাতে তাঁর কিছু যেত আসত না।

একবার হয়েছে কি, রাজা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে স্বয়ং সূর্যদেব তাঁকে বলছেন, 'তোর রাজ্যের উত্তর দিকে চার মাইল দূরে চিরকুরিয়ার টিলার উপরে আমার জন্যে একটি মন্দির তৈরি করবি। তিন মাসের মধ্যে সেই মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করবি। আর প্রতি মাস-পয়লায় তুই নিজে গিয়ে আমার পূজো দিয়ে আসবি।'

স্বয়ং সূর্যদেবের স্বপ্নাদেশ। সুতরাং অমান্য করা যায় না। পরদিনই রাজা মন্ত্রীকে সব কথা খুলে বললেন। মন্ত্রী আদেশ দিলেন রাজমিস্ত্রীদের। মন্দিরের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। বৃষ্টিতে ভিজে মশার কামড় খেয়ে কাশতে কাশতে হাঁচতে হাঁচতে মিস্ত্রীরা মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করল তিন মাসের মধ্যে। চতুর্থ মাসের ১লা তারিখে রাজা স্বয়ং পূজো দিতে যাবেন। মশারির বাইরে বেরুতে হবে ভেবে রাজা ভয়ে শিউরে উঠলেন। শুধু কী তাই? বাইরে তখন কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! কিন্তু উপায় নেই। হাতির পিঠে ছোট সিংহাসনে বসলেন রাজা। সিংহাসনের গায়ে চার কোনায় চারটে মুলি বাঁশের টুকরো খাড়া করে বাঁধা হল। বাঁশের ডগায় দড়ি বেঁধে টাঙ্গান হল ছোট্ট মশারি। বৃষ্টিতে ভিজলেও অন্ততঃ মশার হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

মন্দির যাত্রা শুরু হল শোভাযাত্রা করে। বিরাট শোভাযাত্রা। সবার সামনে হাতির পিঠে রাজা। পিছনে ঘোড়সওয়ারের দল। সবার পিছনে পায়ে হেঁটে অগুনতি মানুষ। শোভাযাত্রা চলেছে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ বেয়ে। অবশেষে মন্দিরের সামনে এসে থামল তারা। রাজা নামলেন হাতি থেকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! রাজার শরীরে কোথাও এক ফোঁটা জল লাগেনি। সবাই অবাক্। রাজার মশারি তৈরি করে যে মণিপুরী কারিগর, সে সেই শোভাযাত্রায় ছিল। ডাক পড়ল তার। প্রথমটায় সে ভড়কে গেল। তারপর সব শুনে তাজ্জব বনে গেল। মশারিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ খুব খুশী হয়ে উঠল। রাজাকে করজোড়ে বলল, 'মহারাজ যদি আজ্ঞা করেন তবে এ রহস্য সম্পর্কে কিছু বলি।' রাজা বললেন, 'বল।'

কারিগর বলতে লাগল, 'মহারাজ, সবই সূর্যদেবের কৃপা। তাঁর দয়াতেই আজ রাজ্যের একটি বড় রকমের সমস্যার সমাধান হল। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশাও বোধ হয় ঘুচল।' প্রজারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। জানতে চাইল, সমস্যাটা কিসের, সমাধানটাই বা কিরূপ। রাজা সবাইকে চুপ করতে বললেন। কারিগর আবার বলতে শুরু করল, 'মহারাজ, আমরা জাতিতে মণিপুরী। কাপড় বোনা আমাদের জাত-ব্যবসা। আমাদের হাতের কাজের জন্য এ রাজ্যের বেশ সুনাম আছে'—

রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আসল কথা বল।' কারিগর বলল, 'সে কথাই তো বলছি মহারাজ। তারপর মশারিটা রাজার হাতে দিয়ে বলল, 'দেখুন মহারাজ, এর উপরের দিকটা ভিজে, কিন্তু নীচে কোথাও জল লাগেনি। ডবল বুনানি দিয়ে চারটে কাপড় জুড়ে পুরু এক প্রস্থ কাপড় বানিয়েছি। গাবের মত এক রকম ফল পাওয়া যায় বনে। সেই ফল নিংড়ে রস বার করে কাপড়ে লাগিয়েছি। সেই রসের এত গুণ কে জানতো! দেখুন, একটুও জল গলতে দেয়নি।'

প্রজারা জয়ধ্বনি করল, 'জয়, মহারাজ মেঘবর্মার জয়। জয়, সূর্যদেবের জয়।'

মাথা চুলকে মন্ত্রী বললেন, 'কিন্তু তাতে প্রজাদের কি মঙ্গল হল।'

হাতির পিঠে ছোট সিংহাসনে বসলেন রাজা। [পৃষ্ঠা ৭২০

কারিগর মুচকি হেসে ভারিক্কী চালে বলল, 'হলো মন্ত্রীমশাই, হল। বৃষ্টিতে চার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রাজামশাই একটুও ভিজলেন না। মহারাজ সদয় হলে প্রজারাও এবার বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তাদের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা হতে পারে।'

প্রজারা এবার আকাশফাটা চিৎকার জুড়ে নিবেদন করল, "মহারাজ সদয় হোন। আমাদের দুঃখ দূর করুন।'

সূর্যদেবের মন্দিরের চাতালে বসে হাত তুলে প্রজাদের আশ্বাস দিলেন রাজা। কারিগরের নাম ছিল ছত্র সিং। ছত্র সিংএর কীর্তিকে অমর করে রাখা হল। জিনিসটির নাম দেওয়া হল ছত্র বা ছাতা।

পরদিন থেকে রাজার ঢালাও আদেশে শত শত ছাতা তৈরী হতে লাগল। প্রজাদের দুঃখ দূর হল। গল্প শেষ হলো। কিন্তু বিলুর সাড়া নেই। বিলু তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

শ্রীজয়দেবকুমার সিংহ

"জানিস ঘন্টিদা ফিরেছে!"

"তাই নাকি, কবে ফিরলো।"

"শুনলাম গতকাল রাতে নাকি এসেছে।"

"ভালই হলো ঘন্টিদার ঘণ্টাপর্বের আর একটা অধ্যায় বাড়লো।"

আমরা পাড়ার কয়টা ছেলে ঘন্টিদাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় দেখি ঘন্টিদাই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ঘন্টিদা আমাদের পাড়ারই ছেলে। বয়সে আমাদের চেয়ে তিন চার বৎসরের বড়; পড়াশোনায় একেবারে গোবরগণেশ। এক ক্লাসে চার পাঁচ বৎসর থেকে যতক্ষণ না মাস্টার-মশাইরা বিরক্ত না হয়ে অন্য ক্লাসে তুলে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ক্লাসেই থেকে যান। এ হেন ঘন্টিদা প্রতি বৎসর পরীক্ষায় ফেল করে কয়েক মাসের জন্য কোথায় হারিয়ে যায়। যখন ফিরে আসে তখন নিয়ে আসে রসালো গল্পের ঝুড়ি। তাছাড়া ঘন্টিদা নিজেও দুই একটা বানিয়ে বলতে পারে। শুনতে মন্দ লাগে না। তাই ঘন্টিদা আসতেই আমরা তাকে চেপে ধরে বললাম, "কী ঘন্টিদা এত দিন আমাদের ফেলে কোথায় গিয়েছিলে?"

"আর বলিস না, সে অনেক কথা।"

"সে কথাগুলিই তো আমরা শুনতে চাই।"

"না না, সেসব বলা যায় না।"

আমরা বুঝলাম ঘন্টিদা দাম বাড়াবার চেষ্টা করছে। আমরাও ছাড়বার পাত্র না। আমরা বললাম, "তোমার এই পর্বের অভিযানের কাহিনী শোনবার জন্য আমরা চাতক পাখির মত বসে আছি।"

"কি যে গ্যাস দিস না!"

"না না, বিশ্বাস কর।"

"তোদের নিয়ে আর পারা গেল না। চল কোথাও গিয়ে বসা যাক। এখানে দাঁড়িয়ে তো আর গল্প বলা যাবে না।"

সামনে একটা রকে ঘন্টিদাকে মাঝে বসিয়ে আমরা চারপাশে গোল হয়ে বসলাম।

ঘন্টিদা তার ঘণ্টাপর্ব আরম্ভ করতে যাচ্ছে এমন সময় আমি বললাম, "ঘন্টিদা একেবারে নির্ভেজাল ছেড়ো না, একটু মিশিয়ে—।"

"তোদের স্বভাবই ঐ না আরম্ভ করতেই বকতে শুরু করেছিস।"

"না না দাদা, তুমি আরম্ভ কর। আমরা আজ জ্বালাবো না।"

"আমি আরম্ভ করছি, তবে একটা শর্ত আমার গল্প বলার সময় কেউ কথা বলতে পারবে না। আর কথা বললে যে পর্যন্ত গল্প বলা হবে সেখানেই শেষ—সবাই রাজী।"

আমরা আর বাক্যব্যয় না করে রাজী হয়ে গেলাম।

ঘন্টিদা শুরু করলো ঃ

এবারও তো পরীক্ষায় ফেল করলাম। এখন বাড়িতে ঢুকি কি করে। অনেক চিন্তা করলাম। শেষে মা দুর্গার নাম জপ করতে করতে বাড়িতে ঢুকলাম। মা দুর্গা বোধহয় বিরূপই ছিলেন। বাড়িতে ঢুকতে দেখে বাবা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। মুখে যা আসলো তাই বললেন। শেষে একপ্রকার গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বের করে দিলেন। ভেবেছিলাম মা হয়তো আমায় সমর্থন করবেন। কিন্তু সেও দেখলাম বাবাকে নীরব সমর্থন করছেন। রাগে দুঃখে আমার কান্না পেতে লাগলো। স্থির করলাম এখানে আর থাকবো না। যেখানে দুই চোখ যায় সেখানে চলে যাব।

সারাদিন ধরে অনেক জায়গায় ঘুরলাম। দেহ মনে একটা অবসন্নতা দেখা গেল। বেলা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাগটাও কমে আসতে লাগলো। বিশেষ করে তখন খুব খিদে পেয়েছিল। কি করি? সঙ্গে মাত্র একটা টাকা আছে। শেষ সম্বল। খরচ করবো তাও মনের সায় পাচ্ছিলাম না। আবার বাড়িতে ফিরে যেতেও মন চাইছিল না।

হাঁটতে হাঁটতে কখন হাওড়া স্টেশনে এসে গেছি বুঝতে পারি নি। এইবার মাথায় একটা খেয়াল এলো—দূরপাল্লার একটা গাড়ি করে চলে গেলে হয় না। বেশ হয় তাহলে। কেউ আমায় কোনও দিন খুঁজে পাবে না। খিদেটা বেশ উৎপাত শুরু

করেছিল। অগত্যা টাকাটা ভাঙ্গিয়ে দশ পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে রাস্তার কলের জল খেয়ে পেটটা সাময়িকভাবে ভর্তি করলাম।

হাওড়া স্টেশনের ভিতরে ঢুকে গেলাম। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় কোন্ গাড়ি যাবে জানি না। জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে পাছে ধরা পড়ে যাই এই ভয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতেই উঠে পড়লাম। গাড়িটা বেশ ফাঁকা ছিল। তাই জানালার ধারে জায়গা করে নিলাম। তখন আবোলতাবোল অনেককিছু ভাবছিলাম। মা-বাবাকে জব্দ করা যাবে ভেবে মনে মনে আনন্দ হচ্ছিল। একটু পরেই গাড়িটা ভরে গেল।

গাড়ি চলতে শুরু করলো! কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। গাড়িটা কোথায় যাবে জানি না। আবার টিকিটও কাটিনি। তাই ঘনঘন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিলাম। এতক্ষণ মনে আনন্দ ছিল, সেটা আর রইলো না। রাত হয়ে আসছিল তাই ভয়ের মাত্রাটাও বাড়তে লাগলো।

এবার গাড়িতে চেকার উঠলো। আমার কাঁদ কাঁদ অবস্থা, এবার আর রক্ষে নেই। কী করি। ধরা পড়লে সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। বাথরুমে গিয়ে ঢুকবো? তাও হয় না। চেকার একেবারে কাছে এসে গেছে। ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলাম।

চেকার আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো, "খোকা, টিকিটটা দেখি।"

ভয়ে আমার জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে আসতে লাগলো। কোনমতে ঢোঁক গিলে বললাম, "দেখুন আমার কাকা···আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে টিকিট কাটতে গেছেন, এখনও ফিরে আসেননি।" কথাগুলি বলে আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম।

চেকার বললো, "কোথায় যাবে?"

এই রে সেরেছে—এবার ঠিক ধরা পড়ে যাব! সামলে নিয়ে বললাম, "সে তো জানি না।"

"মানে?"

"আমার এই কাকা, বাবার মামাতো ভাই এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলো। তাই কোথায় থাকেন ঠিক জানি না।" কথাগুলি খুব কষ্টে বললাম।

"সত্যিই এ চিন্তার কথা। এই রাতের গাড়ি, তোমার কাকা যদি গাড়ি ফেল করে থাকে তবে এই রাতে কোথায় যাবে?" চেকার সহানুভূতির সুরে কথাগুলি বললো।

আমার কথাগুলি শুনে কৌতূহলী জনতার একটা ভিড় জমে গেল। তাদের মধ্যে থেকে একজন বললো, "এই খোকা পরের স্টেশনে নেমে ডাউন ট্রেনে কলকাতা ফিরে যেও।"

আর একজন বললো, "কী খোকা হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে পারবে তো?"

এইসব দেখে আমি একটু দম ছাড়বার সময় পেলাম তাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম,

'পারবো'। এবার চেকার বললো, "ঠিক আছে খোকা পরের স্টেশনে নেমে গাড়িতে একটু খোঁজ করো, যদি তোমার কাকা অন্য কামরায় উঠে থাকে। আর যদি নাই দেখা পাও তবে বাড়ি ফিরে যেও।" কথাগুলি বলে সে অন্যদিকে চলে গেল। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। পরের স্টেশনে ঐ কামরা থেকে নেমে অন্য কামরায় গেলাম। নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম—ভাল করেছি, কী মন্দ করেছি। কিন্তু বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্যও মনের সাড়া পেলাম না।

এবার চেকার বললো, "ঠিক আছে খোকা পরের···

গাড়িটা প্রায় একঘণ্টা চলার পর থেমে গিয়ে আর চললো না। সব লোক নেমে গেল। জানতে পারলাম গাড়ি আর চলবে না। এখানেই শেষ। মহা সমস্যায় পড়লাম। কী করি।

গাড়ি থেকে স্টেশনে নামলাম। স্টেশন ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম পাঁশকুড়া স্টেশন। নামটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। নামটা কোথায় শুনেছি মনে করতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল পটলমামা (মার পিসতুতো দাদা) এখানে থাকেন। উকিল তিনি। কোথায় থাকেন জানি না। কয় বৎসর আগে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। তাতেই চেনা। স্টেশনের বাইরে গিয়ে হাত আন্দাজে কাকার খোঁজ করতেই বাড়ির ঠিকানা পেয়ে গেলাম।

প্রায় দশমিনিট হাঁটবার পর বাড়ির সন্ধান পেলাম। কড়া নাড়ার শব্দে মামা বেরিয়ে এলেন আর আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে বললেন, "ওগো দেখ কে এসেছে।" মামার ডাকে মামীমা আর ছোট ভাইবোনেরা বেরিয়ে এলো। মামা মামীমাকে প্রণাম করলাম। এবার মামীমা বললেন, "বাড়ির সবাই ভালো তো।" বাড়ির কথা শুনে মনটা জ্যাঁৎ করে উঠলো।

সামলে নিয়ে বললাম, "হ্যাঁ বাড়ির সবাই ভাল আছে, আপনারা কেমন আছেন?" এবার মামা বললেন, "কীরে কোন ক্লাসে উঠলি?" মনে মনে ভাবলাম মিথ্যা কথা যখন বলতেই হবে তখন ভাল করেই বলি! বললাম, "ক্লাস ইলেভেনে উঠলাম।" মামীমা ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ করে বললেন, "ঘন্টিদার পায়ের ধুলো নে। হীরের টুকরো ছেলে। সরমার (আমার মার নাম) কী ভাগ্য।" মামা বললেন, "কি গো ওকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবে? না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।" ওদের সাথে বাড়ির ভিতরে গেলাম।

এবার মামার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মামা রাশভারী লোক, খুব গম্ভীর প্রকৃতির। আধুনিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুই পছন্দ করেন না। বাড়িতে কোনপ্রকার গানবাজনা এমনকি নেশা করবারও উপায় নেই। বাড়িতে কোন লোক এলে লুচি, সুক্তি খাওয়াতেও আপত্তি নেই, কিন্তু চা খাওয়াতে পারবেন না। এইরকম মামার পাল্লায় পড়ে প্রথমে আমি একটু হাঁপিয়ে উঠলাম। সেটা বেশীক্ষণের জন্য নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যানেজ করে নিলাম।

প্রতি সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের জন্য মন উসখুস করতো। কি করবো, আর উপায় কী। তাই সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের কাছ থেকে এক চায়ের দোকানে চা খেয়ে আসতাম। একদিন মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চা খাওয়ার অভ্যাস আছে নাকি?"

বিনীতভাবে বললাম, "ওসব বাজে অভ্যাস আমার নেই।"

মামা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাবাস।" এইভাবে খেয়েদেয়ে মনের ফুর্তিতেই ঘুরতে লাগলাম। একের পর এক ম্যানেজ করে চলতে লাগলাম। একদিন প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। সেদিন বিকালে মামাতো ভাইবোনদের নিয়ে আমার দুঃসাহসিক আরও অভিযানের কথা শোনাচ্ছিলাম। যেমন একবার নষ্টচন্দ্রের সময় পেলুদের বাড়ি থেকে কচি শসা চুরি করতে হবে। রাত ছাড়া উপায় নেই। বাড়ির সিঁড়ির গেটে তালা দেওয়া, কী করে বেরোই। অনেক রাতে মায়ের কাপড় থামের সাথে বেঁধে……। বাইরে খুট করে একটা শব্দ হলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না মামা আমাদের কাছে আসছেন। মামা প্রতিদিন বিকালে কোর্ট থেকে ফিরে ছেলেমেয়েদের কাছে ঘুরে যান, দেখেন ছেলেমেয়েরা কোনরকম বাজে সময় নষ্ট করছে কি না। আমার সেটা জানা ছিল। তাই প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, "বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র জীবনে কত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তবেই তাঁরা জীবনে……।"

"সাবাস ছেলে, তোরা সব ঘন্টিটার কাছে বিকালে মহাপুরুষের জীবনী শুনবি।" কথাগুলি বলে মামা চলে গেলেন। তারপর আমি আমার নষ্টচন্দ্র পর্ব শেষ করলাম।

এরপর আর একদিন ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। মামার বাসায় বাথরুম আছে। বাথরুমে বেরসিকেরও গান গাইতে ইচ্ছে করে। তাই আমারও গান গাইবার জন্য মন ছটফট করতো। কি করা যায়। তাই খুব নীচু গলায় গুনগুন করে গান গাইতাম। সেদিন মামার বাঁজখাই গলায় পিলে চমকে গেল, "কে বাথরুমে গান করে?" সামলে নিয়ে বাইরে গিয়ে বিগলিত ভাবে বললাম, "কি হয়েছে মামা?"

"গান করছিলি নাকি? হাতে ওটা কি?"

"হাতে গীতা। আমার আবার স্নানের সময় একটু আধটু গীতা না পড়লে মনটা খুঁতখুঁত করে।"

"বাঃ বাঃ বেশ ছেলে। বেঁচে থাক। এই বয়সে ধর্মভক্তি কয়জনের মধ্যে দেখা যায়।"

কথা শেষ করে মামা চলে গেলেন। এবার বলি কিভাবে বেঁচে গেলাম। মামা যে একদিন আসবেন সেটা বুঝতে পেরেছিলাম তাই আগে থেকে একটা গানের বইএর মলাটে গীতার একটা মলাট লাগিয়ে নিয়েছিলাম।

ম্যানেজ করে আর কতদিন চলে। একদিন ধরা পড়ে গেলাম, মামা আমায় ধরে রাখতে পারলেন না।

কয়েকদিন হলো মামার বাড়িতে আমার সমবয়সী আর একজন ছেলে এসেছিল। তার সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। রাতে এক জায়গায় শুতাম। সকালে উঠে একসঙ্গে চা সিগারেট খেতাম।

সেদিন রাতে কয়েকজন অতিথি আসায় মামা আমার কাছে এসে শুলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জানতে পারিনি। সকালে উঠে অভ্যাসমত মামাকে ছেলেটা ভেবে ধাক্কাতে লাগলাম, "এই ওঠ সকাল হয়ে গেছে। চা, সিগারেট খেতে যাবি না।" কোন সাড়া শব্দ নেই। শেষে রেগে গিয়ে লেপ তুলে সাপ দেখার মত চমকে উঠলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। পিছন ফিরে দেখি মামাও আমার পিছে এসে গেছে। আমি দৌড়তে শুরু করলাম। মামাও আমার পিছু পিছু দৌড়তে লাগলেন। সকালবেলায় আমাদের এই দৌড় দেখে রাস্তার সবাই অবাক্ হয়ে গেল।

দৌড়তে দৌড়তে কখন স্টেশনে এসে গেছি বুঝতে পারিনি। দেখি একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে মালগাড়িতেই উঠে পড়লাম। ভাগ্য ভালো একটু পরেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। পিছনে তাকিয়ে দেখি মামা শ্যেনদৃষ্টিতে মালগাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মনের মধ্যে যেন এক দ্বন্দ্ব চলছে 'আহা ধরেও ধরতে পারলাম না।"

———

লইসা! বানজা!
প্রফেসর প্রিয়নাথকে এই ঘরে নিয়ে এস!
একটু পরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন প্রফেসর প্রিয়নাথ. — তাঁর সঙ্গে এল দুজন অমানুষিক জীব···
বাবা!
জয়ন্ত!
প্রফেসর প্রিয়নাথ! দেখছেন তো আপনার ছেলে ভাল আছে — এবার আমাদের ফরমুলাটা দেবেন?
না!
প্রফেসর প্রিয়নাথ! আপনাকে বন্ধুর মত বলছি শুনুন - ফরমুলাটা আমাদের দিন। আমার প্রস্তাবে রাজী না হলে আপনার ছেলের শরীর থেকে জীবন্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে নেব!

জয়ন্তের ছাল-ছাড়ানো শরীরটা দেখতে কি আপনার ভাল লাগবে? ... প্রফেসর প্রিয়নাথ আমার প্রশ্নের উত্তর দিন!
সন্ন্যাস! তোমার প্রশ্নের উত্তর বাবা দেবেন না— আমি দিচ্ছি!
আঃ!
শুরু হল লড়াই ...

(চলবে)

ডম্বলদার বাঘ শিকার

কমল লাহিড়ী

শেষ পর্যন্ত চিরিমিরিতেই যাওয়া ঠিক হল। শিউলী তো পাহাড়ে ওঠার আনন্দে পাড়াময় বলে বেড়াতে লাগল। আমাদের বাইরে যাবার কথা। মাও খুব খুশী হয়েছিল। কারণ গতবারই ছোট মাসি অনেক করে লিখেছিলেন মধ্যপ্রদেশের পূজো দেখতে যেতে। কিন্তু বাবা ছুটি পেলেন না, তাই যাওয়া হলো না। ছোট মাসির সঙ্গে অনেক বছর মার দেখা নেই।

আমার কিন্তু পাহাড়ের চেয়ে ডম্বলদার সঙ্গটাই বেশী লোভনীয় মনে হচ্ছিল। সেবার ডম্বলদা কলকাতায় এসে, যা সব বাঘ ভালুকের গল্প করেছিল। আমার তো শুনেই ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল চিরিমিরির পাহাড়ে।

এখানে তো চিড়িয়াখানা ছাড়া বাঘ, ভালুক দেখাই হয় না। তাও বছরে একবার —বড়দিনের সময়। আর ডম্বলদা—রোজ তার বন্দুক দিয়ে বাঘ-হরিণ তাড়া করে। ছোট মেসো ওখানকার কোলিয়ারীর ম্যানেজার। তাই ডম্বলদা ছোটবেলা থেকেই বন্দুক চালাতে শিখেছে।

অবশেষে, পূজোর ছুটির সঙ্গে আরও কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আমরা চিরিমিরির দিকে পাড়ি জমালাম। দুইবার গাড়ি বদল করে সন্ধ্যেবেলায় চিরিমিরি স্টেশনে নামলাম। শিউলী তো ট্রেন থেকে নেমেই "দুর্গম গিরি-কান্তার মরু" গান গেয়ে উঠল।

পাহাড়ের গায়ে কেটে কেটে সিঁড়ি উঠে গেছে। ডম্বলদার হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলাম আমি। বাবা কলকাতা থেকেই টেলিগ্রাম করে আমাদের যাবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। মেসোমশাই জীপ নিয়ে আর সবাইকে সঙ্গে করেই আমাদের নিতে এসেছেন।

পাহাড়ের উপরে ছোট্ট শহর চিরিমিরি। মা ছোট মাসিকে জড়িয়ে ধরে উঠছেন। বাবাও মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গল্পে মশগুল। ডম্বলদাকে একটু একা পেয়েই আমি বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে ডম্বলদা বলল, ওই যে দেখছিস—

ওটা হলো সিদ্ধিবাবার পাহাড়। ওখানে একজোড়া স্পটেড্ ডিয়ার আছে। আমার খুব পোষা। তোকে দেখাব।

বড় বড় চোখ করে আমি বললাম, আর ভাল্লুক !

মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব এনে ডম্বলদা বলল, দূর, গেঁইয়া কোথাকার, ভাল্লুক তো আমাদের বাংলোর পাশেই রোজ ঘুরঘুর করে। ওরা সব পোষা কুকুরের মত। মহুয়া-ফুল খেতে আসে। লেপার্ড-বাঘ আর হরিণ দেখবি তো পাহাড়ে যেতে হবে।

ডম্বলদার গেঁইয়া কথাটা গায়ে না মেখে আমি আবার ভাল্লুক প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি, আজ ভাল্লুক আসবে ডম্বলদা !

—আসবে মানে, দেখবি চল বাছাধনেরা কেমন ঘোঁত ঘোঁত করে মহুয়া ফুল খাচ্ছে। আমি তুড়ি মারলেই দৌড়ে পালাবে।

প্রায় ষাটটার মত সিঁড়ি ভেঙে আমরা উপরে উঠলাম। শিউলী বসে হাঁফাচ্ছে। বাবার অবস্থাও শোচনীয়। বাবাকে দেখে ছোট মাসি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগলেন। অল্প একটু বিশ্রাম করেই সবাই জীপে উঠলাম।

মেসোমশাইয়ের বাংলোর সামনে জীপ থামতেই ডম্বলদা লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। একবার বাবার দিকে তাকিয়ে আমিও ডম্বলদার সঙ্গ নিলাম। ভয়ে ভয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখছি। কিন্তু উজ্জ্বল আলোর জন্যই বোধ হয় ভাল্লুক দেখতে পেলাম না।

পরদিন সকালে উঠেই ডম্বলদাকে পাকড়াও করলাম। আমাকে নিয়ে জঙ্গলের কিছুটা রাস্তা ঘুরে এল ডম্বলদা। চিরিমিরি ছোট্ট জায়গা হলে কি হবে—সব কিছুই যেন ছবির মত সাজানো। উঁচু-নীচু রাস্তাগুলোও বেশ পরিষ্কার—ঝকঝক করছে। পূজোর আর মাত্র পাঁচদিন দেরি। স্থানীয় বাঙ্গালীরা বেশ ধুম করে পূজো করেন। কলকাতা থেকে রেলগাড়িতে চড়েই মা দুর্গা আসেন এই পাহাড়ের দেশে। নবমীর দিন রাত্রে থিয়েটার হয়।

ডম্বলদার মুখে চিরিমিরির দুর্গাপূজোর নানান গল্প শুনতে শুনতেই হাঁটছিলাম। আমার মন কিন্তু এই সব পূজোর গল্পে তেমন আনন্দ পাচ্ছে না। বাঘ বা ভাল্লুক দেখানোর কোনও কথাই ডম্বলদা বলছে না। এমন কি যে দুটো স্পটেড্ ডিয়ার ডম্বলদার পোষা তাদের কথাও কিছু শুনতে পেলাম না।

কলকাতার ছেলে হয়ে বার বার ডম্বলদার মুখে গেঁইয়া শোনার ভয়ে বাঘের কথা বলতেও পারছি না, কোলিয়ারীর কিছুটা জায়গা দেখেই ডম্বলদার সঙ্গে বাসায় ফিরলাম।

দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, চুপিচুপিই ডম্বলদার ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকেই তো

নিজের বন্দুকটা একটা লম্বা লোহার শিক দিয়ে পরিষ্কার করছে।

আমার চোখ ছানাবড়া। দেখি ডম্বলদা তার নিজের বন্দুকটা একটা লম্বা লোহার শিক দিয়ে পরিষ্কার করছে। আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল, আয় তপু—বোস। তোর জন্যই আয়োজন করছি।

ডম্বলদার প্রায় গা ঘেঁষে বসে, আনন্দে ডগমগ হয়েই বলি আমি, আজ বাঘ দেখাবে তো!

দেখাব কিরে—ব্যা টা কে দেখতে পেলে আজ একেবারে এক গুলিতেই ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব। বন্দুকের নলটা ফটাস করে বন্ধ করে বলে ডম্বলদা।

বন্দুকটা টেবিলের উপর রেখে বাইরেটা একবার দেখে নেয় ডম্বলদা। তারপর দরজাটা বন্ধ করে চুপি চুপি বলে, এই তপু, বাবা-মেসো-মা-মাসী আর বিচ্ছু শিউলীটা ঘুমিয়েছে! আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, হ্যাঁ আমি তো বাবার নাক ডাকার শব্দ শুনেই তোমার কাছেই এলাম।

তা হলে চল—এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক। শুভস্য শীঘ্রম্।

কিন্তু এখন বাইরে গেলে যদি কেউ দেখে ফেলে বলে দেয়। এবারে ভয়ে ভয়ে বলি। ডম্বলদা একটা চাপা ধমক দিয়ে বলে, দূর হাঁদারাম, আজ তো ছত্রিশ গাড়িয়াদের করমা উৎসব। কোলিয়ারী ছুটি। দেখলি না তখন সব হলুদ কাপড় পরে দল বেঁধে বাজারে যাচ্ছে। আমাদের চাকরগুলোরও ছুটি আজ। ওরা সব গায়ে ভুষো রং মেখে খুব মহুয়া খাবে তারপর হৈ-হৈ করে সারারাত আগুনের সামনে নাচবে। আমাদের কে খোঁজ করবে ব্যা। তুই বাঘ দেখবি তো আয়।

ডম্বলদাকে আর কথা না বলতে দিয়ে লক্ষ্মীছেলের মত পিছনের দরজা খুলে দুই বীর

শিকারী বেরিয়ে পড়লাম। বন্দুকটা ডান হাতে নিয়ে ডম্বলদা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

কুলীবস্তির কাছে আসতেই প্রচণ্ড শব্দে মাদল আর ঢোলকের বাজনার শব্দ কানে এল। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই বুকটা ঢিপ-ঢিপ করছে।

এদিকে পাহাড়ী রাস্তা শেষ হয়ে জঙ্গলের রাস্তায় পড়েছি। আরও কিছুটা দূর এসে একটা উঁচুমত জায়গা দেখিয়ে ডম্বলদা বলল, তুই এখানটায় একটু বোস ভপু। আমি ওদিক থেকে ঘুরে আসি।

দুই হাতে ডম্বলদাকে জড়িয়ে ধরে বলি, না ডম্বলদা, একা আমি থাকতে পারব না।

ভীতু কোথাকার। এত ভয় করে তুই বাঘ দেখবি কি করে?

একটা বড় মহুয়া গাছ জড়িয়ে ধরে ডম্বলদা··· [পৃষ্ঠা ৭৩৪]

ভয় আমার তখনও যায় নি। তবুও ডম্বলদার এই কথায় রাগই হল। তা ছাড়া কোথায় বাঘ বেরোয় তাও কিছু জানি না। বেরনোর সময় ডম্বলদা একবার শুধু বলেছিল কুলীবস্তির নীচে পাহাড়ী ঝরনার কাছে নাকি একটা বাঘ দুদিন হল ঘোরাফেরা করছে। ডম্বলদার কাছে কুলীর সর্দার সামারু খবর দিয়েছে। তাই একটু বিরক্ত ভাবেই বললাম, তা হলে ডম্বলদা ফিরেই যাই, কাল তো মেসোমশাই শিকারে যাবেন বলেছেন, তখনই না হয় ওঁকে বলে সঙ্গে যাব।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ডম্বলদা বলল, তুই না সত্যি বোকা, আমি কি তোকে একা রেখে যেতে পারি। তোর সাহস দেখছিলাম। নে এখন একটু জল খা। ফ্লাস্ক থেকে ঢাকনা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল ডম্বলদা। এক চুমুকে ছোট গেলাসটা শেষ করে জোরে নিঃশ্বাস ফেললাম।

এদিকে বেলাও পড়ে এসেছে। জঙ্গলের মধ্যে বলেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি অন্ধকারও

হয়ে আসছে। আমার আবার ভয় করতে শুরু করল। রাস্তাও চিনি না। একা যেতে পারব না। ডম্বলদাই বলল, অন্ধকার হয়ে এল—ব্যাটা সামারুটা এখনও আসছে না কেন। আয় আমরা একটু ভিতরে ঢুকে দেখি। কথা কয়েকটা বলেই ডম্বলদা বেশ জোরে হেঁটে একটু এগিয়ে গেল। আমিও ভয়ে ভয়ে পা চালালাম। ডম্বলদাকে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছি কিন্তু ঠিক তখুনি—ওরে বাবারে—মরে গেলুম রে—খেয়ে ফেললো রে,—বলে ডম্বলদার প্রচণ্ড চিৎকার কানে এল।

আমার কথা বলা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। ওর মধ্যেই সামনে চোখ পড়তেই দেখি, একটা বড় মহুয়া গাছ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ডম্বলদা প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে। বন্দুকটা নীচে পড়ে আছে। আর তার থেকে কয়েক হাত দূরে গায়ে কালোডোরা-কাটা চিতাবাঘ না ভালুকের মত কি যেন একটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে।

ব্যস—এইটুকু দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে চাইতেই দেখলাম বাবা মা ছোট মাসী শিউলী সবাই আমাকে ঘিরে রয়েছে। দরজার কাছটায় ডম্বলদাও বোকার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমার তাকান দেখে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এমন সময় ছোট মেসো কাকে যেন ধরে নিয়ে এল ঘরে। সে দিকে তাকিয়েই আবার চোখ বন্ধ করলাম আমি। এবারে শিউলী জোরে হেসে উঠে বলল, ও তো মাসীমাদের দারোয়ান শিউরতন। গায়ে রং মেখে ওরকম চিতাবাঘের মত চেহারা করেছে। তুই কি বোকা রে দাদা।

সত্যিই তাই। পরদিন সকালের চায়ের আসরে ডম্বলদাকে সামনে নিয়ে সে এক হাসির ঝড় বয়ে গেল। শিউরতন নাকি করমা উৎসবের জন্য কাল একটু বেশী মহুয়ার রস খেয়েছিল। আর গায়ে ভুষো রং মেখে চেহারাটাও হয়েছিল অবিকল চিতা বাঘের মত। মহুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে শিউরতন মনের আনন্দে করমা উৎসবে যোগ দিতে আসছিল।

কুলীবস্তির রাস্তাটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি আসা যায়। আর সেই রাস্তায় আসতে গিয়েই শিউরতন আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাইতেই ডম্বলদা—।

পরে ডম্বলদা আর আমার ওই অবস্থা দেখে অবিশ্যি শিউরতনের নেশা ছুটে যায়। আর সেই ছুটে এসে বাড়িতে খবর দেয়।

এর পর পূজোটা বেশ আনন্দেই কাটলো। নবমীর দিন মজা করে সামনের সারিতে গদি-আঁটা চেয়ারে বসে থিয়েটারও দেখলাম। ডম্বলদা কিন্তু আমাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তবে সবচেয়ে বড় কথা, যে কদিন চিরিমিরিতে ছিলাম, ডম্বলদা কিন্তু আমার সামনে একদিনও আর বাঘ-ভাল্লুকের গল্প করে নি।

বিদেশী গল্প

দক্ষিণের কামরা

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

সত্যি ? এ্যাঁ ? সত্যি মরেছে ? ঐ ডাইনী বুড়ী হ্যারিয়েট ? মরেছে তাহলে ? আঃ—

দুঃখ ? তা একটু হয়তো হওয়া উচিত। রক্তের সম্বন্ধ ছিল যখন। আপন মাসী ছিল সম্পর্কে। লোকতঃ ধর্মতঃ—

কিন্তু না, উচিত অনুচিত বুঝি না, হচ্ছে না দুঃখ। কিছুতেই না। মাসীর কাজ মাসী কিছু করেনি। মাকে একবস্ত্রে তাড়িয়েছে বাড়ি থেকে, তিনটে বোনঝি সোফিয়া জেন আমাণ্ডাকে আঙ্গুল মটকে শাপশাপান্ত করেছে পথেঘাটে—ওর জন্যে দুঃখ ? তা আর না হলে চলে ?

ঠাকুর্দার ছেলে ছিল না, দু'টি মোটে মেয়ে, হ্যারিয়েট আর জুলিয়েট। মাকে জপিয়ে জপিয়ে হ্যারিয়েট ছোট বোনটাকে ফাঁকি দিল বিষয় থেকে। বাড়িটা লিখিয়ে নিল নিজের নামে। তারপর তাড়িয়ে দিল একদম।

জুলিয়েট অবশ্য আশ্রয় পেল। এক গরিব ভদ্রলোক ঐ গাঁয়েরই, বিয়ে করলেন তাকে। তাও তিনি আবার মারা গেলেন কয়েক বছরের মধ্যেই। জুলিয়েটের তখন তিন মেয়ে—সোফিয়া, জেন, আমাণ্ডা। দিন কতক যেতে না যেতেই জুলিয়েটও রওনা হয়ে গেল স্বামীর পিছু পিছু। তারপর বছরের পর বছর কাটে, কিন্তু হ্যারিয়েট রয়েছে বেঁচে। একা ও বাড়িটার দক্ষিণের কামরায় সে থাকে। জানলা খুললেই ছোট মাঠখানার ওপারে নদীর কুঁড়ে দেখতে পায়, আর সেই কুঁড়ের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল মটকে মটকে শাপশাপান্ত করে। বোনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিল, সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। তারপর বোন মরেছে, সেও হলো ত্রিশ বছরের মত। তবুও রাগ পড়েনি হ্যারিয়েটের। জুলিয়েট নেই, কিন্তু তার নাকি মেয়ে আছে তিনটে। পথেঘাটে কখনও সখনও হয়তো তাদের দেখেওছে হ্যারিয়েট, কথা বলে নি, ফিরে তাকায় নি, কিন্তু গালিগালাজে কসুর করে নি তবু।

পারলে মেয়েগুলোকে চিবিয়ে খেত বুড়ী, খেতে পারে নি, হয়তো দাঁত ছিল না বলেই কম-সে-কম আশি বছর তো হয়েছিলই ওর ! "তাতে আর হয়েছে কী ?"—বলেছিল বড় বোন জেন একদিন—"আশি তো সামান্য, একশো আশিও বাঁচতে পারে—"

কিন্তু তা বাঁচে নি। মরেছে। আজই সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনল সোফিয়া আর আমাণ্ডা আর ফ্লোরা—

হ্যাঁ, মেজো বোন জেনই শুধু বিয়ে করেছিল, এই তিন বোনের মধ্যে। তা, কচি মেয়ে ফ্লোরাকে রেখে সে মরে গেল দুই বছরের ভিতর, মেয়েটা পড়ল সোফিয়াদের ঘাড়ে। ওর বাপ আবার বিয়ে করে বসেছে কিনা!

সে যা হোক, মরেছে তাহলে। উইল? না, ওসব কিছু নেই। কাকে চিনত বুড়ী যে উইল করে বাড়ি দিয়ে যাবে তাকে? তা ছাড়া, উইল করে যে কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া যায়, সেটা বোধ হয় জানাও ছিল না ওর। জানলে, সোফিয়াদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা সে কি করতো না?

বাড়িটা পেয়েছে সোফিয়ারা। নিজেদের বাড়ি বেচে দিয়ে ওরা উঠে এসেছে এ-বাড়িতে। গাঁয়ের কেউ কেউ নিষেধ করেছিল—"অত বড় বাড়ি কোন্ কাজে আসবে তোমাদের? বরং বেচে দিয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখো।"

সোফিয়া শক্ত মানুষ। কানে তোলে নি সেকথা। ঠাকুর্দার বাড়ি, বেচবো কেন? টাকা? ঐ বাড়ি থেকেই দেদার টাকা রোজগার হবে, দেখ না তাকিয়ে!

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সংসার চালিয়ে আসছে একা সোফিয়া। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল একটু, তার উপরে লেস বোনা, উলের জাম বোনা—এসব থেকেও আয় ছিল কিছু। বোনার ব্যাপারে আমাণ্ডাও অবশ্য সাহায্য করত।

এইবার সব ছাড়ল ওরা। সোফিয়া ছাড়ল মাস্টারি, আমাণ্ডা সেলাইফোঁড়। দুই জনে মিলে বোর্ডিং খুলে দিল মস্ত বাড়িটায়। উপর তলায় চারখানা ঘর, সবই ছেড়ে দিল অতিথিদের জন্য। নীচের তলায় সামনের ঘরখানাই হলো খাওয়ার ঘর; তার পাশে দুই বোন আর এক বোনঝির একটিই শোবার ঘর, তারপরে ভাঁড়ার, তারপরে রান্নাঘর। সুন্দর বন্দোবস্ত। মরলগ আয় মাস গেলে নিশ্চয়ই হবে এ থেকে।

অতিথিদের জন্য ঘর চারখানা। তিনখানা গোড়া থেকেই ভাড়া হয়ে গেল। স্থানীয় লোকেরাই এসেছেন বোর্ডার হয়ে। একজন হলেন সহকারী পাদরি এখানকারই গীর্জার, একজন মহিলা লাইব্রেরিয়ান, তৃতীয়টি এক ধনী বিধবা মিসেস এলভিরা সিমনস্—শহরবাসে আনন্দ না পেয়ে পল্লীজীবনের বৈচিত্র্য আস্বাদন করতে এসেছেন। তিনজনে যা দিচ্ছেন, তাতেই বোর্ডিংয়ের খরচা সব উঠে যাচ্ছে। এখনও দক্ষিণের কামরাটা খালি রয়েছে, ঐখানে কেউ এলেই, ব্যস্, তাঁর কাছে যা প্রাপ্তি হবে, সেটাই পড়বে লাভের খাতে।

ঘরের উমেদার এই গাঁয়েই ছিল আরও দুই একজন। কিন্তু গেরো দেখ! ঐ দক্ষিণের কামরাতে থাকতে হবে শুনেই পায়ে পায়ে তারা পিট্টান দিয়েছে সবাই। কারণটা বোঝা যায়! এই সবে সেদিন ডাইনীবুড়ীটা ঐঘরেই মারা গিয়েছে কিনা! যা নাম যশ ছিল বুড়ীর। জ্যান্তে যার নাম ছিল ডাইনী, মরে সে যে পেত্নী হয় নি, একথা চট করে

...য়ে লোকে বিশ্বাস করবে কেমন করে? না, এত দিন ভাড়াটে জোটেনি দক্ষিণের কামরার, হবে এইবার বুঝি জুটল।

দুপুরের পরেই। ময়দা ঠাসতে ঠাসতে সোফিয়া বলছে আমাণ্ডাকে—"অ্যাক্টন থেকে সেই মাস্টারনি আসছেন রে! আজই!"

"কোন্ ঘরে দিচ্ছ তাকে? দক্ষিণের ঘরটা না কি?"—আমাণ্ডার চোখে মুখে ফুটে ওঠে ভয় আর সংশয়।

"তা ছাড়া আর ঘর আমাদের খালি আছে কোথায় শুনি?"—সোফিয়ার কথায় ঝাঁজ রীতিমত।

"না, তাই বলছিলাম—" ঢোঁক গেলে আমাণ্ডা।

"বলাবলি ঢের হয়েছে, আর নয়"—রীতিমত বিরক্তির সুরে সোফিয়া বলে—"বলি, ঘরখানার দোষটা কী, কেউ দেখিয়ে দিতে পারে? ব্যাপার তো এই যে, হ্যারিয়েট মাসী মারা গিয়েছিল ঐ ঘরে! আচ্ছা, কেউ বুঝিয়ে দিক আমায়, ঐ ঘরে ছাড়া আর সে মরবে কোথায়? সারাজীবন বাস করে গেল ঐ ঘরে, মরবার সময় যাবে কি রাস্তায়? মানুষের যদি আক্কেল কিছু থাকে—"

আমাণ্ডা কথা কইছে না। কিন্তু সোফিয়ার গজগজি সমানে চলছে—"অত যাদের ছুঁৎমুতি, তারা যাক না, আনকোরা নতুন বাড়ি বানিয়ে নিক না গিয়ে! পুরানো ঘরে যদি ...স খুঁজতে হয়, তাহলে কোন বায়নাক্কা না থাকাই ভাল। এমন পুরানো ঘর দুনিয়ায় আছে না কি কোথাও, যাতে কোন-না-কোনদিন কেউ-না-কেউ মরে নি?"

আমাণ্ডা এক তরফা শুনে-যাওয়ার ভূমিকা নিয়ে কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকে। সে ...ত্নু করে টিপ্পনী কাটল একটু—"এ তো খুবই খাঁটী কথা!"

সোফিয়া মুখ তুলে চাইল তার দিকে—"খাঁটী কথা যখন, যাও তো লক্ষ্মী বোন, ঘরখানা খুলে গিয়ে। একটু রোদ বাতাস ঢুকতে দাও। ধুলোটুলো নিয্যস জমেছে, যদিও সেদিনই ঘর সাফ-সুৎরো করে এলাম। যাও, মাস্টারনি তো একটু বাদেই এসে যাবে—"

আমাণ্ডা এখন দিদিকে কেমন করে বলে যে একা যেতে তার ভয় করবে ও ঘরে? এই ভর দিনের বেলায়? দিদি তাহলে তাকে আস্ত রাখবে? নিজে সোফিয়া শক্ত মানুষ, কোন মানুষকে কোনদিন ডরায় নি, এটা আমাণ্ডার চোখে দেখা। আর ভূতকেও দিদি ডরায় না, এটা কানে শোনা আমাণ্ডার। শোনা অবশ্য সোফিয়ারই মুখ থেকে।

পায়ে পায়ে সেই দক্ষিণের কামরার দিকেই চলেছে আমাণ্ডা। উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। পেরিয়ে যাচ্ছে বারান্দা। কিন্তু যতই যাচ্ছে, বুকের মধ্যেটা ঢিপঢিপ করছে তত জোরে জোরে, ততই ঘন ঘন। অবশেষে সেই অলক্ষুণে ঘরখানার দোরগোড়ায় এসে সে একটু না

জিরিয়ে পারল না আর। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রোদে ঝলমল রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। আলোই বল, আলোই সাহস। ঘরে ঢুকলেই আঁধারের আওতায় গিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য মিনিটখানিকের জন্যই, যতক্ষণ না জানালাগুলো খুলে দেওয়া যায়। কিন্তু বরাত মন্দ হলে এক মিনিটেই কী না হতে পারে?

অবশেষে ঝড়াক্ করে এক সময় দরজা খুলেই ফেলল আমাণ্ডা, আর তিলার্ধ দেরি না করে এক রকম দৌড়ে গিয়েই উলটো দিকের জানলা দুটো খট খট করে খুলে দিল চটপট। যাক, পহেলা ফাঁড়া কেটেছে। ঝলকে ঝলকে সোনা রোদ্দুর এসে আছড়ে পড়েছে ঘরের ভিতর, সমুদ্রবেলার জোয়ারের জলের মত। ঘরের কোন কোণ আর অস্পষ্ট নেই। ভয় আর কোথা থেকে বেরুবে হামাগুড়ি দিয়ে?

মস্ত বড় খাট। ছত্রি বল, পায়া বল—সবেতেই ছিট-কাপড়ের ঢাকনা। তাতে সবুজ জমিনের উপর নীল ময়ূরের ঝাঁক ছাপানো, বিছানার উপরে সাদা একটা আস্তরণ। আস্তরণটা তুলে নিয়ে বিছানাটি সুন্দর করে ঝাড়ল আমাণ্ডা, বালিশগুলো নেড়েচেড়ে আবার ঠিক করে সাজাল। তারপরে চাদরখানা আবার পাততে লাগল সব কিছু ঢেকে দেবার জন্য। হঠাৎ এ কী রকম হল?

খাটের কাঠামোতে নীল ময়ূরগুলা সবুজ ছিট ছিল্ যে!

এ তাহলে কী দেখছে আমাণ্ডা? ছিটগুলো যে হলদে জমিনে লাল গোলাপের! ইয়া বড় বড় লাল গোলাপ! কেমনধারা হল এটা? দুই হাতে চোখ কচলে আবার তাকাল আমাণ্ডা। চোখ পিটপিট করে একবার, চোখ ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত করে আর একবার, বারবার তাকাল আমাণ্ডা। নাঃ, হলদে জমিনের উপরে লাল গোলাপের বাহার তেমনি জ্বলজ্বল করছে খাটের গায়ে মাথায় সর্বত্র।

আমাণ্ডা অগত্যা ভেবে নিল, সবুজ নীলের ছিটগুলো সোফিয়া কোন সময় হয়তো বদলে দিয়েছে এ ঘর থেকে। ঘরে ঢুকেই প্রথমটা যদি তার মনে হয়ে থাকে যে আগের সেই সবুজ নীল ছিটই রয়েছে আগের মত, তা হলে কী আর বলা যাবে, নিশ্চয়ই সেটা তার মনের ভুল। আগের সংস্কারই ভুল দেখিয়েছে তাকে।

চুলোয় যাক। তার কাজ ঝাড়পোঁছ করা, সেইটে করে চটপট বেরিয়ে পড়তে পারলেই ঝামেলা চুকল এখনকার মত। মেহগনির বিউরো একটা, তার দেরাজে দেরাজে প্রসাধনের জিনিস রাখবে মাস্টারনি। বিউরোর মাথায় দোল-খাওয়া আয়না। মানানসই রকমের লম্বা মানুষ ওখানে দাঁড়ালে ঠিক তার মুখখানাই ফুটে উঠবে সেই আয়নায়। সব কিছুর উপর দিয়ে চটপট ঝাড়ন বুলিয়ে নিল আমাণ্ডা। চেয়ারে, টেবিলে—হ্যাঁ, ধুলো কিছু হয়েছে বই কি, তবে বেশী না। ঝাড়নের এক এক বাড়িতেই সব সাফ।

খাটের তলাটায় ঝাঁটা মারতে হবে একবার। থাকুক, আগে পাশের খোপটায় উঁকি মেরে আসা যাক একবার। হ্যাঁ, এঘরের বৈশিষ্ট্য হল ঐ খোপটুকু। পাশের দরজা দিয়ে ওখানে যাওয়া যায়, মুখ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা আছে, জল বেসিন তোয়ালে সব কিছু। তাছাড়া দেয়ালে আছে সারি সারি হুক। হ্যারিয়েট মাসী ওতে টাঙ্গিয়ে রাখত তার পোশাকগুলো। এ বাড়িতে প্রথম এসেই মাসীর এক ডজনখানিক নানারকমের পোশাক ওরা ওখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ছাদে, চিলের কোঠাতে একটা তোরঙ্গে তুলে রেখেছে সে সব।

ও ঘরে করবার কিছু নেই তেমন, একবারটি চোখ বুলিয়ে নেওয়া শুধু। পাশের দরজাটা খুলে ফেলল আমাণ্ডা। বড় ঘরের তুলনায় এটা অন্ধকার। হবেই তো অন্ধকার, কারণ জানালা নেই এ-খুপরিতে, যা কিছু আলো আসে বড় ঘর থেকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিল আমাণ্ডা, ভিতরটা দেখে নেবার জন্য।

কিছু দেখতে পাওয়ার আগেই একটা গন্ধ এল তার নাকে। ধঞ্চে শাকের গন্ধ। হ্যারিয়েট মাসীর বিদকুটে অভ্যাস ছিল—পাঁচ দশ মিনিট বাদে বাদেই দুইচার গাছা ধঞ্চে শাক টপ করে মুখে ফেলে দেওয়া আর আয়েস করে চিবোনো। ওর এক ডজন জামা যখন আমাণ্ডারা এখান থেকে চিলের ঘরে নিয়ে যায়, তখন শুকনো ধঞ্চে শাক প্রায় প্রত্যেকটা জামার পকেট থেকে বার করে ফেলতে হয়েছিল।

জামাগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে কবে, ধঞ্চে এখনও এখানে রইল কী করে? অবাক্ হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়েছে আমাণ্ডা, লুকোনো ধঞ্চে আবিষ্কারের আশায়, হঠাৎ হাওয়ার কাপটা লেগে ঝোলানো জামা যেমন করে একদিক থেকে আর একদিকে উড়ে আসে, তেমনি করে, যদিও হাওয়া-টাওয়া এখানে নেই। থাকতে পারেই না জানালা না-থাকার দরুন, তেমনি করে দেওয়ালের দিক থেকে হঠাৎ একটা জামা উড়ে এসে পড়ল ঠিক আমাণ্ডার মুখে।

মানে? এর মানে কী? সব জামা তো ওরা কবে নিয়ে গিয়েছে এখান থেকে। একটা জামা রয়ে গেল কেমন করে? আমাণ্ডা দেখেছিল, হুক থেকে সব জামা, হলদে, নীল, গোলাপী, লাল, সাদায়-কালোয় মেশানো, কালোয়-লালে মেশানো, লালে-সবুজে মেশানো, কোনটা পশমী, কোনটা রেশমী, কোনটা সূতী, হরেক রকমের এক ডজন জামা গাদা করে নিয়ে যাওয়া হল উপরে, ভাঁজ করা হল, বাক্সে বন্ধ করা হল, তারপর দরজায় তালা বন্ধ হল চিলের ঘরের—

অথচ আজ দেখা যাচ্ছে—হলদে-সবুজ গাউনটা পড়ে রয়েছে এই ঘরেই!

কানা! কানা! বিলকুল কানা তারা সবাই! সোফিয়া আমাণ্ডা ফ্লোরা, ঠিকে-ঝি মার্থা সবাই ছুঁচোর মত কানা! প্যাঁচার মত কানা! রয়ে গেল হলদে-সবুজ গাউনটা?

অতিমাত্র বিরক্ত হয়ে গাউনটা এক ঝটকায় হুক থেকে ছাড়িয়ে নিল আমাণ্ডা। নতুন বাসিন্দা ঐ অ্যাক্টনের মাস্টারনি এসে এটা এখানে দেখলে কী মনে করত বল দেখি! ভাগ্যিস সোফিয়া তাকে পাঠিয়েছিল একবার ঘরটা দেখে আসবার জন্য!

গাউনটা ইজিচেয়ারে ফেলে রেখে এইবারে খাটের তলাটায় পালকের ঝাড়ু বুলোতে লাগল আমাণ্ডা। দুই মিনিটে কাজ শেষ। এইবার সে ফিরে যেতে পারে এখান থেকে। তবে সোফিয়ার কাছে যাওয়ার আগে একবার ছাদে উঠতে হবে আবার, ঐ হলদে-সবুজ গাউনটা—

কিন্তু গাউনটা কই? ইজিচেয়ারের উপরে নেই তো!

মানে? এইমাত্র, আমাণ্ডাকে যে দিব্যি গালতে বল, সেই দিব্যি গেলে সে বলতে পারে এইমাত্র সেই গাউন ইজিচেয়ারে রেখে সে খাটের তলায় ঢুকেছিল। আর খাটের তলা থেকে বেরিয়েই সে দেখছে—গাউন নেই ইজিচেয়ারে?

নাঃ, মাথা! মাথাই খারাপ হয়েছে আমাণ্ডার! নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। তাছাড়া আর কোনরকম কারণ বাৎলানো যায় না এ-ব্যাপারের। করব বলে মনে-করা এক কথা, আর হাতে-কলমে করে ফেলা অন্য কথা। এই দুটোতে গুলিয়ে ফেলছে আমাণ্ডা। গাউনটা ইজিচেয়ারে এনে রাখার কথা ভেবেইছিল ও, আনাও হয় নি, রাখাও হয় নি। ওটা নিশ্চয় এখনো ঐ খোপে হুকেই ঝুলছে।

পাশের দরজা আবারও খুলল আমাণ্ডা। কই? গাউন কই?

আধো-আঁধার খুপরির কোণে কোণে দুই চোখ বিস্ফারিত করে করে দেখতে লাগল আমাণ্ডা, না! নেই সে হলদে-সবুজ অপয়া গাউন, কোথাও তা নেই।

হঠাৎ গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল আমাণ্ডার, সে ছুটে বেরিয়ে এল দক্ষিণের কামরা থেকে। সব দোর হাঁ-করা পড়ে রইল, সে ছুটে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

সোফিয়ার খন্তি নড়ছে কড়াতে, ঘন ঘন শব্দ পাওয়া যায় এখান থেকেই। রান্নাঘরে কেক তৈরিতে ব্যস্ত সে। একটা কথা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল আমাণ্ডার। একটা কথা, একটা আশ্বাস। হয়তো, আমাণ্ডা যখন খাটের তলায় ব্যস্ত ছিল, হয়তো ঠিক তখনই সোফিয়া উপরে উঠেছিল একবারটি, আর ইজিচেয়ারের উপরে গাউন পড়ে থাকতে দেখে সেটা হাতে করেই তক্ষুণি নেমে এসেছে আবার। আমাণ্ডার পিঠ ছিল দরজার দিকে, সে দিদিকে দেখতে পায়নি।

কথাটা মনে হতেই অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছিল আমাণ্ডা। নেমে আসছিল এই সংকল্প নিয়ে যে রান্নাঘরে ঢুকেই সে জিজ্ঞাসা করবে যে দিদি গাউনটা এনেছে কিনা। কিন্তু এখন—

ছুটে বেরিয়ে এল দক্ষিণের কামরা থেকে। [পৃষ্ঠা ৭৪০

...ে লোক কেক বানাতে ব্যস্ত, সে ...ক কেক ছেড়ে উপরে উঠতে পারে? দুই মিনিট না নাড়লে সে কেক পুড়ে ...রে না? সোফিয়া কক্ষণো যায় নি উপরে। ওকথা তাকে জিজ্ঞেস করলেই ...ন বকুনি খেতে হবে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবা, সে ...র কতক্ষণ করা যাবে? দিদি ...কডাক শুরু করবে এক্ষুণি। শতেক ...জ পড়ে আছে। তার উপরে ...নির বাসও তো আসবার সময় ... সে এলেই তাকে নিয়ে পড়তে ... অভ্যর্থনা করা, গোছগাছ করে ...য়, স্থিতু হবার সাহায্য করা, তার উপরে তেমন মিশুক লোক যদি হয়, ... কথাও দুই চারটে বলা—সবই ...ভুয়ালীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ...কস্য রাঁধে চমৎকার, কাজেই রান্না-...ই তার সময় কাটে বেশী, বাড়তি ... বাইরের কাজ পড়ে আমাণ্ডার ... ফ্লোরা তা সে তো ছেলেমানুষ, দোকানে-টোকানে যায়, এই আর কি!

ঐ আসে, ঐ আসে করতে করতেই বাস এসে গেল। বাড়ির সামনেই দাঁড়ায় সব বাস। ...ক থেকে আমাণ্ডা, ওদিক থেকে সোফিয়া ছুটে বেরুলো। কেক-এর কড়া উনুন থেকে ...িয়ে রেখেও আসতে হল সোফিয়াকে। কারণ খদ্দের প্রভুর সমান। মাস্টারনি নিজেকে ...ক্ষিত মনে না করে।

বাস থেকে নামলেন এক দশাসই চেহারার পালোয়ান মহিলা। বৃহৎ তোরঙ্গটা ...ই অক্লেশে তুলে বাড়ির সিঁড়িতে রাখলেন। করমর্দন করলেন সোফিয়ার, আমাণ্ডার, ...িকে একবার চোখ বুলিয়ে এনেই বললেন—"সুন্দর জায়গা তো! গরমের ছুটির ... মাস এখানে বেশ কাটিয়ে দিতে পারব। মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, আমার নাম লুইজা স্টার্ক, ...ই নাম দেখেছেন অবশ্য।"

আমাণ্ডা তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে চলল। সোফিয়া ফিরে গেল তার কেক-এর তদারকিতে। মহিলাটিকে মিশুক বলা যায় না বোধ হয়, তবে দরকারী কথাগুলো সশব্দে উচ্চারণ করতে তাঁর আপত্তি নেই। সে সব কথার জোরই আলাদা, যেন মাস্টারনি কথা কইছেন ছাত্রীদের সামনে, আদ্ধেক আদেশ, আদ্ধেক উপদেশ।

"তা ঘর ভালই, বড় বড় জানালা, রোদ্দুর বাতাস, আকাশে মেঘের খেলা, গাছে পাখির গান, বাঃ, বেশ। এমনি একখানা ঘরই চেয়েছিলাম। বেশ থাকা যাবে—"

বলতে বলতে পাশের খুপরির দরজা খুলে ফেললেন মিস্ লুইজা স্টার্ক, আর সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলেন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে—"এ কী রকম কাণ্ড মিস্ আমাণ্ডা? আমাণ্ডা গিল বলেছিলেন, না? এ কী রকম কাণ্ড? আগের ভাড়াটের জামা এখনও ঝুলছে? নতুন লোক আসছে তা জেনেও আগের—"

আমাণ্ডা ওদিকে আড়ষ্ট। খোপের ভিতর হুকে ঝুলছে সেই হলদে-সবুজ গাউন! যা তখন অন্তর্হিত হয়েছিল ইজিচেয়ারের উপর থেকে, স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করেও আর খুঁজে বার করতে পারে নি আমাণ্ডা।

মিস স্টার্ক তখনও বকে যাচ্ছেন—"কী গন্ধ, ছিঃ ছিঃ, ধঞ্চে শাকের গন্ধ মনে হচ্ছে? ধঞ্চে শাকের গুদোম ছিল না কি খুপরিটা? আপনারা বুঝি বোডারদের খুব ধঞ্চের চাটনি খাওয়ান? আমার ওটা একেবারেই চলবে না, মনে রাখবেন—"

খুপরির দিকে আর না গিয়ে লুইজা স্টার্ক পোর্টম্যাণ্টো খুলতে লেগে গেলেন। জিনিস-পত্র বার করে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে। আমাণ্ডা একটানে হলদে-সবুজ পোশাকটা হুক থেকে নামিয়ে এনে শক্ত মুঠিতে ধরল সেটাকে, আর সেই অবস্থায়ই সেটা নিয়ে ছুটল চিলের ঘরে, একেবারে তোরঙ্গে ওকে তালা বন্ধ করে রেখে আসবে সে।

মিস্ স্টার্ক জামা কাপড় বার করছেন, সেগুলি টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন খুপরির ভিতর হুকে হুকে। প্রসাধন সামগ্রীগুলি বার করে গুছিয়ে রেখেছেন বিউরোর দেরাজে দেরাজে। তারপর শুরু করেছেন নিজের সাজসজ্জা। ডিনার ছয়টায়। পাঁচটা বেজে গিয়েছে। দোলন দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একখণ্ড লকেট আটকাচ্ছেন বুকে।

লকেটখানি খুব প্রিয় লুইজার। একখানা দামী ওনিক্স পাথর, তার উপর থেকে নীচে লম্বমান সারি সারি নানা রংয়ের উজ্জ্বল রেখা। বরাবরই ডিনারে বসা বা বাইরে বেরুবার সময় এই লকেট তিনি পরেন। আজও পরেছেন।

সাজপোশাক সেরে নিজের চেহারাটাকে কে একবার ভাল করে না দেখে? লুইজাও দেখছেন। হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন—এ কী? এ লকেট কী তাঁর সেই লকেট? এ ওনিক্স হবে কেন? এ তো একটা চ্যাপ্টা সোনার ঢেলা। নানা রংয়ের উজ্জ্বল রেখার

জায়গায় এতে রয়েছে কিছু কাঁচা কিছু পাকা কয়েকগাছি চুলের একটা বিনুনি। এ কেমন করে হল?

তাড়াতাড়ি লকেট খুলে হাতে নিলেন ভাল করে দেখবার জন্য। এ আবার কী? হাতে নেওয়া মাত্রই সোনার ঢেলা আবার ওনিক্স হয়ে গেল যে!

আঃ, তাই বল। ভুল দেখেছেন লুইজা। চোখ বোধ হয় খারাপ হয়ে আসছে একটু একটু। হতেও পারে। বয়স হল তো!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওনিক্স আবার গলায় পরলেন লুইজা। ব্যস! ওনিক্স আবার সোনার ঢেলা! মাথা গরম হয়ে উঠল ভদ্রমহিলার। তারপর তিনি একবার খুলছেন, একবার পরছেন লকেট। খুললেই ওনিক্স, পরলেই সোনা। অবশেষে তিতোবিরক্ত হয়ে তিনি সেটা পরেই ফেললেন চূড়ান্তভাবে। সোনা তো সোনাই! সোনা কিছু নিন্দের নয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি চলে গেলেন ডিনারের ঘরে। মনে কিন্তু তাঁর ঘোর সন্দেহ ঢুকেছে একটা। সন্দেহটা এই যে মাথাই তাঁর খারাপ হতে বসেছে, চোখ নয়। আশ্চর্য হবার কিছু নয়। চল্লিশ বছর মাস্টারি করার পরেও মাথা খারাপ হবে না একটুও। এও কি একটা কথার মত কথা না কি? বিশেষতঃ, তাঁর মায়ের কোন্ এক মাসী নাকি ছিল রীতিমত পাগলী।

ডিনারে অন্য অতিথিরাও আছেন। আলাপপরিচয় হল। আগের থেকে যাঁরা আছেন তাঁরা মিস স্টার্কের ঘরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যেমন আলোহাওয়া, তেমনি শৌখিন আসবাব, সোফার ছিটকাপড়ের ঢাকনাগুলিই বা কী তোফা! হলুদ জমিনের উপরে লাল গোলাপগুলি যেন দাঁড়িয়ে দেখবার মতই।

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন লুইজা স্টার্ক—"হলুদ জমিনে লাল গোলাপ? সে-ঢাকনা তাহলে এঁরা তুলে নিয়েছেন। আমি তো দেখলাম—সবুজ জমিনে নীল ময়ূরের সারি।"

আমাণ্ডা উপস্থিত ছিল পরিবেশনের জন্য। তার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল এ কথা শুনে। শেষ যখন ওঘর থেকে এসেছে সে, ছিঁট কাপড়টা ছিল হলদে জমিনে লাল গোলাপ। ইতিমধ্যে তা আবার রং পালটে ফেলেছে নিজের?

তা ফেলুক। আমাণ্ডা কোন কথা কইল না। ফাঁক পেতেই সরে পড়ল টেবিলের কাছ থেকে।

খাওয়া শেষ হতেই লুইজা উঠে পড়লেন—"বাসখানাতে ধকল গিয়েছে খুব দেহের উপর দিয়ে। সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছি—"

নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বার জন্য তৈরী হচ্ছেন লুইজা। গলার লকেট নিয়ে আবার সেই ম্যাজিক তখনকার মত। গলায় থাকলে সোনা, খুলে হাতে নিলেই ওনিক্স। রেগেমেগে

লকেটখানা দেরাজে পুরে ফেললেন লুইজা। মাথা খারাপ হচ্ছে, আর কিছু নয়। রাতটা যদি ঘুম হয়, এ ভাবটা কেটে যেতেও পারে। না যদি হয়, ভেবে ঠিক করা যাবে কাল যে কী এখন করণীয়।

পোশাক-আশাক খুলে ফেললেন লুইজা। এগুলো এখন টাঙিয়ে দিতে হবে পাশের খুপরিতে। রাত্রিবাসটা সেখানেই ঝুলছে অন্যসব পরিচ্ছদের সঙ্গে, পেড়ে এনে পরতে হবে সেটা। তাহলেই প্রস্তুতি শেষ, শয্যায় অঙ্গ ঢেলে দিয়ে নিদ্রার সাধনা।

খুপরির দরজা খুলতেই চক্ষুস্থির!

এসব কার পোশাক? সারি সারি ঝুলছে হুকে হুকে? এর একটাও তো লুইজার নয়! কার পোশাক এনে কে রাখল ঝুলিয়ে এখানে? আর লুইজার পোশাকগুলোই বা তারা নিয়ে গেল কোথায়? এ ঐ বাড়িওয়ালীদেরই কাজ, তাতে সন্দেহ কী? ওরা ছাড়া কে করবে? ভয়ানক লোক তো ওরা!

রাগে রি রি করছে লুইজার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। যে পোশাক ছেড়েছিলেন, তাই আবার পরে ফেললেন, তারপর গটগট করে নেমে গেলেন। রান্নাঘরে একা সোফিয়া তখন বাসনপত্র গুছিয়ে রাখছে। আজকের মত কাজ তার শেষ।

লুইজা ফেটে পড়লেন ঘরে ঢুকেই। "এ কী ব্যাপার? পোশাক রাখবার জায়গায় আমার নিজের পোশাক একটাও নেই, তাদের জায়গায় ঝুলছে সারি সারি অন্য লোকের জিনিস? এ কী রকম রীতি-চরিত্র আপনাদের?"

সোফিয়া প্রায় এক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লুইজা স্টার্কের দিকে। তারপর বলল—"চলুন, আমি উপরে গিয়ে দেখছি ব্যাপারখানা কী।"

খুপরি খোলার পরে দেখা গেল—লুইজা স্টার্কেরই পোশাক ঝুলছে প্রতি হুক থেকে। অন্য কারও কোন পোশাকের নামগন্ধও নেই সেখানে।

সোফিয়া তাকিয়েও দেখল না লুইজার দিকে—"কোন গোলমাল হয়েছে বলে তো মনে হয় না! শুভরাত্রি—" এই বলে সে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

লুইজা মরমে মরে গেলেন তো বটেই, ভয় পেয়ে গেলেন নিদারুণ। নিজের জন্য ভয়। মাথা যে দস্তুরমত খারাপ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নাস্তি। এখন একটা জিনিসই করার আছে। ছুটি উপভোগ মাথায় থাকুক, এক্ষুণি শহরে ফিরে যাওয়া দরকার, ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে আর একদিনও দেরি করা ঠিক হবে না।

রাত্রি তাঁর কীভাবে কাটল তিনিই জানেন, সকালে আর নামলেন না। আমাণ্ডা তাঁর প্রাতরাশ ঘরেই পৌঁছে দিল যখন, তাকে বললেন—"খুবই দুঃখিত। মাথার অসুখ আমার আগে থেকেই আছে, কাল রাত্রে সেটা হঠাৎই বেড়ে গেল। আমার আর থাকা হচ্ছে না এখানে।"

আমাণ্ডা নীরব জিজ্ঞাসায় তাকাল অতিথির পানে, কিন্তু লুইজা স্টার্ক মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছেন ঐ কথার পরেই। আমাণ্ডার নির্বাক্ কৌতূহল মেটাবার দিকে কোন আগ্রহই তার দেখা গেল না।

দুপুরেই লুইজা স্টার্ক পোর্টম্যাণ্টো নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন—বাস কখন আসে, তারই প্রতীক্ষায়। মিসেস এলভিরা সিমনস্ কোথা থেকে ফিরলেন যেন ঠিক তখনই। দেখা হতেই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কী হল? চলে যাচ্ছেন হঠাৎ?"

"একটা পুরানো অসুখ ছিল, বংশানুক্রমিকই বলা যায়। কাল রাতে আবার টের পেয়েছি সেটা। ডাক্তার দেখাতে দেরি করা উচিত নয়—" উত্তর দিলেন লুইজা।

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে এলভিরা দ্বিধার সঙ্গে বললো—"তা ছাড়া আর কিছু নয়, আশা করি? বলি, ঘরে কোন রকম—"

"যীশু কহো! ঘরের আবার কী? খাসা ঘর, চমৎকার ঘর, অমন খোলামেলা ঝকঝকে ঘর বহু ভাগ্যে পাওয়া যায়—"

যেভাবেই কথাটা বলুন লুইজা, বলার পরই দেখতে পেলেন—বাস এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে পড়লেন বাসে।

বেচারী এলভিরা সিমনস্! লুইজার কথায় তিনি ষোল আনা বিশ্বাস করে বসলেন। দক্ষিণের কামরা যে খাসা ঘর, চমৎকার ঘর—এতে তাঁর বা অন্য বোর্ডারদের কোনোদিনই ছিল না সন্দেহ। ওঘর সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি ছিল অন্য কারণে। সে-কারণ যে অমূলক, তা তো প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন লুইজা স্টার্ক। একরাত্রি সেখানে বাস করেও তো দিব্যি সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে তিনি গটগট করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। পুরানো অসুখ? পুরোনো অসুখ সবাইয়েরই থাকতে পারে, সে অসুখ চাগাড় দিলে সবাইকেই শহরে ছুটতে হয় ডাক্তার দেখাবার জন্য—

যা হোক, আর দেরি করা নয়। দক্ষিণের ঐ কামরাখানার উপরে চিরদিনই লোভ ছিল এলভিরার। নেন নি শুধু কুসংস্কারের বশে। সে-কুসংস্কার যে কত বাজে, তা তো প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন ঐ ভদ্রমহিলা। সুতরাং, এ সুযোগ আর ছেড়ে দেওয়া নয়।

নিজের ঘরে না ঢুকে এলভিরা রান্নাঘরে গিয়ে সোফিয়াকে পাকড়ালেন—"দক্ষিণের কামরা আমিই নেব, আজ থেকেই—"

লাইব্রেরিয়ান এলিজা লিপিনকোট সেকথা শুনে মাথা নাড়ল। অনৈসর্গিকে ওর করুণ আশঙ্কা। আড়ালে ডেকে এলভিরাকে সে বলল—"যে ঘরে ছিটকাপড়ের রং মুহুর্মুহু বদলায়, ময়ূর যেখানে দেখতে দেখতে গোলাপফুল হয়ে যায়, সে ঘর ভাড়া নেওয়ার মানে কি জান? নিজের হাতে কবর খুঁড়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া। ঐ কর্মটি করো না সখি!"

সখী কিন্তু নাছোড়বান্দা। মালপত্র নিয়ে দক্ষিণ কামরায় উঠল গিয়ে।

দিন কাটল ভালই। রাত্রে শোবার পরই হলো জঞ্জাল। যেই ঘুম আসছে, অমনি গলাটা করেছে সুড়সুড়। দুই একবার গলায় হাত বুলিয়ে দেখলেন এলভিরা। কিছুই তো নয়!

তৃতীয়বারে কিন্তু হাতে ঠেকল কী একটা। কী? কী?—একগাছা দড়ি। কিসের দড়ি? বোঝা গেল না। দড়িটা চট করে সরে গেল। গেল, কিন্তু ঘুমের চটকটা ভেঙে দিয়ে গেল এলভিরার। তিনি উঠে বসলেন বিছানায়। গরমের দিন, জ্যোৎস্না রাত, জানালা খোলা, হাওয়া আসছে ফুরফুর করে। আর সেই হাওয়ায় ভাসছে—

কী ভাসছে? একটা টুপি। মেয়েরা কেউ কেউ শোবার সময়ে যে-রকম নাইট্‌ক্যাপ মাথায় পরে শোয়, সেই রকমই সাদা টুপি একটা। সেইরকমই, তবে এর ফিতে যেন বড় বেশী লম্বা। এলভিরার সন্দেহ হল ঐ ফিতেটাই হয়তো তাঁর গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা ধরতে গেলেন তিনি।

যাঃ, কোথায় টুপি! ফিতে সমেত টুপি হাওয়ায় মিশে গেছে একদম।

ধুত্তোর! চোখের ভুল ছাড়া আর কী হতে পারে? এলভিরা আবার শুয়ে পড়লেন। ঘুমিয়েই পড়লেন একটু। তারপর হঠাৎ জেগে উঠলেন ধড়মড় করে। নিঃশ্বাস আটকে আসছে যে! মুখের উপর কী একটা জিনিস চাপা দেওয়া রয়েছে। আর গলা? গলায় সেই দড়ি। দড়ি-গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে কে যেন জোরে জোরে টানছে তার দুই প্রান্ত ধরে।

গলায় ফাঁস! দম বন্ধ! এলভিরা প্রাণপণ করে দড়িটা চেপে ধরলেন। ধরতে গিয়ে কিসে যেন হাত ঠেকে গেল! কিসে? কিসে? সাঁড়াশির মত শক্ত বাঁকানো কয়েকটা আঙুলে। কী শক্ত? অথচ কী ঠাণ্ডা! বরফের আঙুল! এলভিরা ভগবান স্মরণ করতে লাগলেন।

আঙুলের পেষণ আলগা হয়ে এল ক্রমশঃ, দড়ি খুলে গেল গলা থেকে, মুখের উপর থেকে টুপিটা টেনে ফেললেন এলভিরা। সত্যিই টুপি, সত্যিই তাতে ইয়া লম্বা দড়ি, তারের মত শক্ত। টুপি হাতে নিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন এলভিরা। জ্যোৎস্নার ঢেউ ঢুকছে জানলা দিয়ে। সেই জ্যোৎস্নায় কী যেন ভাসছে। হাওয়ায় ভর করে ভাসছে। কী?

একখানা মুখ। কী বীভৎস! কী হিংস্র! একখানা মুখ, কোঁচকানো, থ্যাঁতলানো মুখ একখানা! বুড়ো মানুষের মুখ! আশি বছরের বুড়ীর মুখ! তার চোখ থেকে হিংসার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। কী যেন শুনতে পাচ্ছেন এলভিরা—

"আমার বিছানায় শুবি? আস্পর্ধা তো কম নয় তোর!"

এলভিরা ছুটে বেরুলেন ঘর থেকে সেই নিশুতি রাতে। ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়লেন তাঁর পুরানো ঘরে, পরিত্যক্ত বিছানায়। শুয়ে শুয়ে ভগবান স্মরণ করতে লাগলেন সারা রাত ধরে।

পরদিন ভয়ানক উত্তেজনা বাড়িতে। লুইজা স্টার্ক টুঁ শব্দটি করেন নি, কিন্তু এলভিরা

সবাইকে ডেকে হুবহু বর্ণনা দিয়ে গেলেন রাত্রির ঘটনার। সোফিয়া স্থির, অমাণ্ডা ফ্লোরা ভয়ে কাঁপছে, এলিজ লিপিনকোট বুকে ক্রশ আঁকছে আঙুল দিয়ে দিয়ে। আর থেকে থেকেই বলছে—"আমি তোমায় আগেই তো বলেছিলাম এলভিরা! আগেই তো বলেছিলাম।"

এই সময় পাদরি সাহেব একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন সোফিয়ার কাছে—"ঘরটা ভাড়া নেওয়ার কথা আমি বলছি না, সাহস থাকলেও সে-সামর্থ্য আমার নেই, পয়সার দিক দিয়ে। আমি চাই, কেবল দুই এক রাত ঐ ঘরে শুয়ে থাকবার অনুমতি। কোন ভৌতিক প্রভাব যদি থাকে ও-ঘরে, আমি ভগবানের নামকে হাতিয়ার করে সে শক্তির সঙ্গে লড়াই করব।"

একখানা মুখ। কী বীভৎস! কী হিংস্র! [পৃষ্ঠা ৭৭৬

সোফিয়ার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। সে সানন্দে অনুমতি দিল।

কিন্তু পাদরি রাত্রে মোটে ঢুকতেই পারলেন না সে ঘরে। দরজা খোলা, কিন্তু ঐ দরজাপথে যেন অদৃশ্য পাহাড় একটা দাঁড়িয়ে আছে পাদরির পথ রোধ করে। পাদরি পালোয়ান না হতে পারেন, কিন্তু গড়পড়তা প্রৌঢ় পুরুষের গায়ে যে-রকম শক্তি থাকবার কথা, তার চেয়ে কম তাঁর কোনদিনই নয়। কিন্তু আজ সেই অদৃশ্য বাধাকে অতিক্রম করবার মত শক্তি তিনি নিজের দেহে খুঁজে পেলেন না। প্রাণপণে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও না।

শেষরাত্রে শ্রান্ত দেহে তিনি ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

পরের রাতে সোফিয়া বলল—"আজ আমিই শোব দক্ষিণের কামরায়।"

অমাণ্ডা আর ফ্লোরা কেঁদে ভাসিয়ে দিল, কিন্তু সোফিয়া গ্রাহ্য করল না তাদের কান্নাকে। তার রোখ চেপে গিয়েছে। সে নিজে একবার দেখবে এই পেত্নীর কেরামতি!

রাত বেশী নয়। এগারোটা হবে। দোল-খাওয়া আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে সোফিয়া। এর পর পোশাক খুলবে, তারপর শুয়ে পড়বে বিছানায়!

চুল খুলছে। দেহটাতে স্বস্তি পাচ্ছে না মোটেই। চাপা সর্দির মত কী যেন চেপে ধরেছে বুকটা মাথাটা। কেমন যেন লাগছে। কে যেন কানে কানে ফিসফিস করছে। কান পেতে শুনতেই কথাগুলো বুঝতে পারল সোফিয়া, চিনতেও পারল। চিনতে পারল তার নিজের গলায়ই কথা বলে। সোফিয়া নিজেই নিজেকে বলে যাচ্ছে—"তোর মা একটা পাজী মেয়ে ছিল। তাকে তাড়িয়ে আমি ঠিকই করেছিলাম। তাড়াব তোদেরও। ঝাড়েবংশ ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো তোদের—"

নিজেই বলছে, নিজেই শিউরে শিউরে উঠছে। জ্ঞান একেবারে তখনও হারায়নি তার। ভূতে-পাওয়া! একটা প্রবাদ আছে গাঁয়ে ঘরে—ভূতে পায় মানুষকে। হ্যারিয়েট মাসীর ভূত পেয়ে বসছে সোফিয়াকে। তার মাথায় যে চিন্তা উদয় হচ্ছে, তা তার নিজের চিন্তা নয়। সেই মাসীরই চিন্তা। যে কথা তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে, তা তার নিজের কথা নয়, সে কথা হ্যারিয়েট ডাইনীর!

হঠাৎ, আরও একটা মোক্ষম চমক খেলো সোফিয়া। আয়নায় ঐ যে মুখখানা ফুটে উঠেছে, ও কার মুখ? সোফিয়ার মুখে তো অমন অষ্টাবক্র বলি রেখা নেই। তার গাল তো অমন তোবড়ানো নয়! তার মুখ তো অদন্ত নয় অমন, তার ঘোলাটে চোখে তো হিংসার আগুন ছোটে না অমন করে! মাথার চুল তো অমন শণের নুড়ি নয় তার!

ও-মুখ সোফিয়ার নয়, হ্যারিয়েট ডাইনীর। সোফিয়া ডাইনী হয়ে গিয়েছে।

হুড়মুড় করে সে ছুটে বেরুলো। নিজের ঘরে গিয়ে আমাণ্ডাকে টেনে তুলল—আমাণ্ডা! আমাণ্ডা! তাকিয়ে দেখ তো! ভাল করে তাকিয়ে দেখ আমার দিকে। কাকে দেখছিস্?"

আমাণ্ডা অবাক্ হয়ে বলল—"কেন? দেখছি তোমায়, আবার কাকে দেখব?"

"ঠিক বলছিস? আমায় দেখছিস তো? তোর দিদি সোফিয়াকে?"

আমাণ্ডার কাছে বারবার আশ্বাস পেয়ে তখন দুই হাতে চোখ ঢেকে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল সোফিয়া।

কাঁপুনি থামলে সে বলল—"এ বাড়িটা বেচতেই হবে রে!" *

* মেরী উইলকিন্স ফ্রীম্যান রচিত "দ্য সাউথ ওয়েস্ট চেম্বার" অবলম্বনে।

---

৭১২ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১। ছাওনির কোনে কাল রং নেই
২। পাটাতনে একটা কান আঁকা নেই
৩। ঘোড়ার গায়ে একটা ফোঁটা নেই
৪। মেয়েটির বুকে জামায় ডোরা কাটা নেই
৫। মাথার রিবনের টুকরো নেই
৬। ঘোড়ার মাথার সাজে দাগ নেই
৭। মেয়েটির জুতা কাল।

জাঠরাজা সূরযমল

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

আজ মনে পড়ে কিশোর সূরযমলের—সেদিনের সে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। পালক পিতা বদন সিংকে কী অপমানেরই না সম্মুখীন হতে হয়েছিল!

জনে জনে জাঠ মোড়লেরা বদন সিংকে বেইমান বলে গালি দিয়েছিল। দিয়েছিল তাঁর মুখের উপরেই। অভিযোগটা কী? না, বদন সিং নাকি জাতির স্বার্থরক্ষার নাম করে নিজের স্বার্থচিন্তাই করেছেন বরাবর। সংহত শক্তিমান্ জাঠরাষ্ট্র গঠনের প্রলোভন দেখিয়ে হরণ করেছেন গ্রামপতিদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

জাতি? রাষ্ট্র? সে-সব বস্তুকে কোন পবিত্রতাই দিতে স্বীকার করেনি মোড়লেরা কোনদিন: সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল ক্ষুদ্র মোড়লদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, যা নাকি ধারাবাহিক ভাবে এক যুগ ধরে বলি দিয়ে এসেছেন প্রথমে চূড়ামন, তারপর তাঁর ভাই ভাও সিং, এবং বর্তমানে ভাও সিংয়েরই পুত্র বদন সিং।

বদন সিং নতমস্তকে শুনছিলেন সে-সব অভিযোগ আর তার আনুষঙ্গিক ভৎর্সনা। 'বেইমান, স্বজনদ্রোহী, স্বার্থসর্বস্ব'—বিশেষণগুলি মোড়লদের মুখে মুখে ঘুরছিল। সূরযমলের মনের কী অবস্থা! পিতার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন স্থাণুর মত, কেবল কখনো-সখনো [illegible], বুঝি-বা নিজেরই অজান্তে মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে আসছে কটিলগ্ন কৃপাণের বাঁটখানা। ছুঁয়েই চকিতে সরে আসছে আবার, ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শ চোখের পলকে তাঁকে সচেতন করে তুলছে স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে।

পিতার উপস্থিতিতে বালক পুত্রের কী আর করণীয় থাকতে পারে স্বাধীনভাবে?

এমন যদি হত যে বদন সিংয়ের অসাক্ষাতে কেউ সূরযমলকে এসব কথা শোনাচ্ছে, তাহলে এতক্ষণ রক্তের বন্যা বয়ে যেত এখানে।

সেদিন নিষ্কম্প নিথর মৌন অবলম্বন করে বসে ছিলেন বদন সিং, আর প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পিছনে কিশোর সূরযমল। হ্যাঁ, আজকের এই প্রৌঢ় সূরযমলই সেদিন কিশোর ছিলেন, সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর হল বই কি!

বৎসরও কেটে গিয়েছে অনেকগুলি, ঘটনাও ঘটেছে অনেক। ঐ যমুনার ঢেউয়ের মত সে-ঘটনাবলীর মধ্যেও ছিল একটা ধারাবাহিকতা, একটা নিরবচ্ছিন্ন পারম্পর্য। নিরবচ্ছিন্ন এবং অনিবার্য। যেমন করে একটা ঘটনাই আর একটার জন্ম দিয়েছে, তা ভাল করে মনেও পড়ে না এখন।

পিতা বদন সিংই মীরাট আর আগ্রার গ্রামগুলিকে নিজের শাসনে এনেছিলেন। আর তার ফলেই তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল সমগ্র জাতির ধিক্কারের। অবশ্য যতই মর্মন্তুদ হোক, সে-ধিক্কারে তিনি কাতর হন নি। নিজে তো কাতর হন নি বটেই, পুত্রকে কাতর দেখে তার কাঁধে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই বলে।

কী সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তা মনে পড়ে এখনও। বলেছিলেন—"যে যায় জাতির অগ্রে, সে যায় একাকী। মহতের অন্যতম পুরস্কার লোকনিন্দাও।"

বদন সিংই পত্তন করে গিয়েছিলেন এই জাঠ রাষ্ট্রের। তখন এর আয়তন ছিল ক্ষুদ্র, বিরুদ্ধবাদীরা ছিল সংখ্যায় গরিষ্ঠ। জীবনব্যাপী সাধনায় সূরযমল সেই আয়তনকে আজ এত বাড়িয়েছেন যে মুঘল আমলের দশটা পরগনা এখন তার অন্তর্ভুক্ত। ভরতপুরে দুর্ভেদ্য দুর্গ গঠন করেছেন সূরযমল, জাঠরাজ্যের এখন ভরতপুরই রাজধানী।

আজ সূরযমল সেই রাজ্যের রাজা। রাজপদ গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তিনি করেন নি। সমারোহ করে রাজ্যাভিষেকও তাঁর হয় নি। তবু তিনি রাজা, জাঠমাত্রকেই একবার জিজ্ঞাসা কর—"সূরযমল লোকটা কে?" ঝটিতি উত্তর আসবে—"আমাদের রাজা—"

কোথায় গেল সেই বিরুদ্ধবাদীরা?

সবাই আছে। নিজেরা না থাকুক, তাদের স্থলাভিষিক্তেরা আছে, সন্তানেরা আছে। আছে ঠিকই, কিন্তু বিরোধিতা উবে গিয়েছে তাদের অন্তর থেকে। এখন তারা সূরযমলের ভক্ত। বিপদে তারা ভরতপুরের দিকে তাকায়, সাহায্য আসবে ওখান থেকে। সম্পদে তারা ভেট পাঠায় ভরতপুরে, গাছে ফল পাকলে প্রথম সুপক্ক ফলটি রাজার ভোগে নিবেদন করে।

কেমন করে এল এ আমূল পরিবর্তন?

আপনা থেকে আসে নি, অনায়াসেও আসে নি। জীবনব্যাপী সেবার ফলেই সূরযমল হতে পেরেছেন এক কোটি জাঠের আপন জন।

মুঘলের অত্যাচারে সূরযমলই রক্ষা করেছেন তাদের। মারাঠা বর্গী যখন এসে চৌথের দাবি জানিয়েছে, তখন, পারলে সূরযমল তাদের মেরে তাড়িয়েছেন, না-পারলে দাবির টাকা নিজের কোষাগার থেকে মিটিয়েছেন, কোন জাঠ গৃহস্থের গরু-বাছুর টানাটানি করতে দেন নি বর্গীদের।

এমনি করেই—

হ্যাঁ, যুগব্যাপী অক্লান্ত সেবায় সূরযমল স্বীকৃতি আদায় করেছেন নিজের রাজপদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জাঠদের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা। সর্বভারতীয় মহাজাতির অঙ্গীভূত এই জাঠজাতির লোক বলে তাদের অন্তরে আজ গর্ববোধ জেগেছে, এইটিই সূরযমল নিজের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে মনে করেন।

এল ১৭৬০। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দেখা দিয়েছে বৈদেশিক হানার ঘনঘটা। আহমদ শাহ আবদালি! এর আগেও কয়েকবারই সে আক্রমণ চালিয়েছে পঞ্চনদে। মুমূষু মুঘল দরবারের সঙ্গে সংঘাতও হয়েছে কয়েকবার। একবার আবদালিকে পরাজয় স্বীকার করে পালাতে হয়েছিল, তা ঠিক। কিন্তু পরবর্তী সবগুলি অভিযানেই বাদশাহকে সন্ধি করতে হয়েছে প্রচুর ক্ষতি ও লাঞ্ছনা সহ্য করে।

তারপর বাদশাহ অনন্যোপায় হয়ে শরণ নিয়েছেন মারাঠা শক্তিচক্রের। পেশোয়া দিয়েছেন অভয়, সিন্ধিয়া এসে বসে আছেন দিল্লীতে—বাদশাহের অভিভাবক হয়ে। বাদশাহের নামে হিন্দুকুশের পাদদেশ পর্যন্ত ধাবিত হচ্ছে বর্গী অশ্বারোহীরা। বাদশাহী খাজনা এবং মারাঠী চৌথ আদায়ের জন্য।

এ-অবস্থা আবদালির অসহ্য। পঞ্চনদের অনেক অংশ সে নিজের রাজ্যভুক্ত বলেই দাবি করে। লাহোর শহরও সে-দাবির ভিতর পড়ে। এসব অঞ্চল থেকেও যদি মারাঠীরা চৌথ আদায় করতে থাকে, তবে তো বিজয়ীর ইজ্জত আর থাকে না আবদালির!

তাই আবদালি সমর-সজ্জা করছে আবার। এবারের তোড়জোড় আগের চেয়ে অনেক বেশী। কারণ সে জানে—মারাঠার হাতে একবার পরাস্ত হলে তাকে আর কখনও ভারতমুখী অভিযান নিয়ে খাইবারের বাইরে আসতে হবে না। মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবে, তখন যে-কোন ক্ষুদ্র উপজাতি স্পর্ধাভরে উপেক্ষা করবে দুরানী সুলতানের দাবি ও অধিকার।

দুরানী আসছে। মারাঠাও বসে নেই।

পেশোয়া বালাজিরাও অভূতপূর্ব সেনা-সমাবেশ করবেন এবার। হানাদারকে রুখতেই হবে। তা নইলে ভারতজোড়া হিন্দু-পদ-পাদশাহী প্রতিষ্ঠার আশা সমূলে উৎপাটিত হবে। মুসলিম সূর্য অস্ত গিয়েছে ভারতের রাজনৈতিক গগন থেকে। তার প্রমাণ—দিল্লীর লাল কেল্লায় বসে স্বয়ং বাদশাহ সিন্ধিয়ার ভাতায় উদরান্ন সংস্থান করছেন।

সে-আহ্বান জাঠরাজা সূরজমলের কাছেও এল।

অস্ত গিয়েছে মুসলিম সূর্য। এবার ভারতের আকাশে সগৌরবে উড্ডীন হোক ছত্রপতি শিবাজীর গৈরিক পতাকা। সার্বভৌম মারাঠার ছত্র-ছায়াতলে দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হোক হিন্দু-রাজগণের প্রভুত্ব। যেমন সৃষ্টি হয়েছে সিন্ধিয়া হোলকার ভোঁসলে গাইকোয়াড়ের নিজস্ব রাজ্যাধিকার, তেমনি হোক জাঠ শিখ জাতিসমূহের অভ্যুদয় এবং জীর্ণ-অবসন্ন পুরাতন রাজপুত নৃপগণের পুনঃযৌবন প্রাপ্তি।

সে-আহ্বান জাঠরাজা সূরজমলের কাছেও এল। ভারতের সমস্ত হিন্দু-রাজাকে পুণায় আমন্ত্রণ করেছেন পেশোয়া বালাজিরাও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্তদানের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কোন্ কাপুরুষ এ-আহ্বান উপেক্ষা করবে?

জাঠ সূরজমলও পুণায় গেলেন। তাঁর স্থৈর্য ও দূরদর্শিতা, রাজনীতিজ্ঞান ও রণ-নৈপুণ্যের প্রচুর খ্যাতি পেশোয়াও শুনেছেন। প্রচুর সমাদরে তিনি গ্রহণ করলেন জাঠ-রাজাকে!

সমবেত হয়েছেন সমগ্র ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ। সে এক নব রাজসূয় সভা। সে সমাবেশের জৌলুশে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে নিখিল হিন্দুজাতির। অসীম আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে তাদের অন্তর—আবার তাহলে ফিরে এল হিন্দুর গৌরবের দিন, রাম-যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে নতুন পরিবেশে।

পেশোয়া উদ্বোধন করলেন সভার। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেন নিপুণভাবে, জানতে চাইলেন কোন্ রাজ্য থেকে কী-পরিমাণ সহযোগিতার প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

যার যেমন সাধ্য। কেউ যেন নিজরাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সৈন্যবল বাইরে না পাঠান। উদ্বৃত্ত সৈন্য কার কত আছে?

কারও লক্ষ, কারও বিশ হাজার, কারও এক হাজারের মত। জাঠরাজা সূরজমল বললেন—"সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি একান্ত নিঃস্ব। আভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখবার জন্য একান্ত অপরিহার্য যতগুলি সৈনিক, তার চেয়ে একটিও বেশী আমি রাখি

না। কেন রাখব? একটা লোককে আটকে রাখা মানেই একখানা লাঙ্গলকে নিশ্চল করে রাখা। দেশের উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যাহত করা। তা আমি করি না!

"আর বৈদেশিক আক্রমণ? তা যখন হবে, তখন তো চাষী আসবে লাঙ্গল ছেড়ে, ব্যাপারী আসবে দোকান ছেড়ে, আমি ছুটে যাব অন্য রাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে। না, অতিরিক্ত সৈন্য বলতে আমার কিছু নেই, রাখি না কখনও।"

সূরযমলের বক্তব্য শেষ হল।

এ-ধরনের কথা যে-কোন রাজার মুখ থেকেই বেরুক, সে-রাজা রাজন্য সমাজে একটু অসাধারণ বলে গণ্য হতে বাধ্য। সমবেত নরপতিরা তাই দু-চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন সূরযমলের দিকে। তারপর—

না, পেশোয়া নন, অন্য কে এক রাজা মন্তব্য করলেন—"তাহলে আপনার কাছ থেকে সেনাসাহায্য আমরা পাচ্ছি না।"

সূরযমল বললেন—"সে কি কথা? পাচ্ছেন না মানে? আমি কি তাই বললাম? আমি বলেছি—উদ্বৃত্ত সৈন্য আমার থাকে না কখনও। আবার এও বলেছি যে বৈদেশিক আক্রমণ হলে সমস্ত জাঠ জাতিটাই সর্বকর্ম ফেলে হাতিয়ার নিয়ে ছুটে আসবে রণক্ষেত্রে। আমি এক কোটি জাঠ দেব—স্ত্রীপুরুষে মিলিয়ে। জাঠ নারীরাও জানে হাতিয়ার ধরতে—"

নিস্তব্ধ সভাকক্ষ। এ-ক—কো-টি!

কেউ মনে করল—লোকটা নিছক ধাপ্পা দিচ্ছে। আবার কেউ ভাবল—এমনি সর্বস্ব-পণ যারা দেশের জন্য করতে পারে, তারাই দেশের সুসন্তান।

স্বয়ং পেশোয়া ঐ প্রথম শ্রেণীতে। সূরযমলের উপর অনাস্থা এসে গেল তাঁর।

সে অনাস্থা আরও গভীর হল। সেনাপতি নির্বাচনের প্রশ্ন উঠতেই।

পেশোয়া প্রস্তাব করলেন—তাঁর জ্ঞাতি ভাই ভাও সাহেবকে সম্মিলিত হিন্দু-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হোক। আসল নাম ওঁর সদাশিব রাও। যুদ্ধ? তা করেছেন বই কি! দেশীয় রাজা দুই চারজনের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছেন মাঝে মাঝে।

অনেকেই মুখ বাঁকালেন প্রস্তাব শুনে। কিন্তু পেশোয়ার মুখের উপরে, এ-কথা নিয়ে প্রতিবাদ করতে রুচি হল না কারও। নিজে প্রস্তাব এনেছেন পেশোয়া, তাঁর একটা সম্মান আছে তো!

কিন্তু সূরযমল স্পষ্টবক্তা—"পেশোয়া জানেন না যে আহমদ আবদালি কী চীজ। আমি জানি, কারণ আমার ঘরের কাছ দিয়েই আবদালি হামেশা আনাগোনা করেন। ভাও সাহেবের মত পোশাকী সেনাপতির কাজ নয় আবদালির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। ভাও যে সাহসী এবং বীর, তাতে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু সৈনাপত্য আলাদা জিনিস। মারাঠাদের

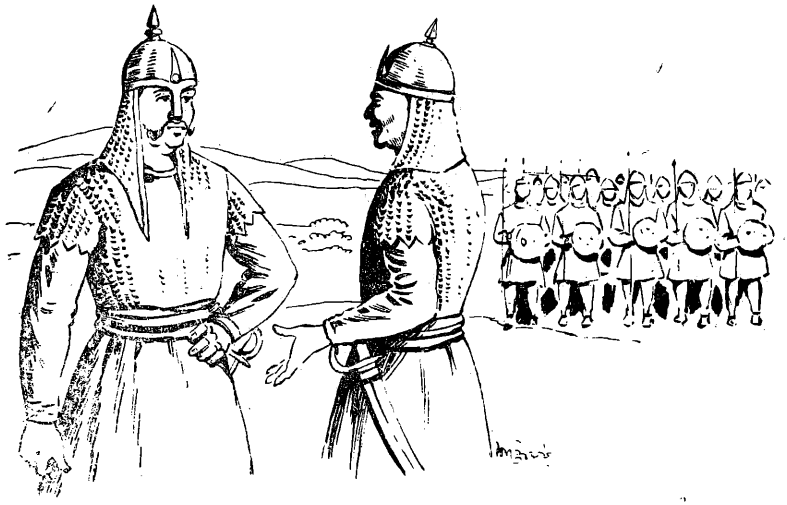

"বহুক্ষণ যুদ্ধ···দেখে নেবেন" [পৃষ্ঠা ৭৫৫

ভিতর থেকেই সেনাপতি নিয়োগ হোক, তাতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু দোহাই ভগবানের, ভাওকে নয়, ভাওকে নয়!"

পেশোয়ার চোখ মুখ রক্তবর্ণ। "কাকে সেনাপতি করতে বলেন মারাঠাদের ভিতর থেকে?"—প্রশ্ন করলেন তিনি।

"আপনার মহাদাজী সিন্ধিয়াকে করতে পারেন। তিনি সৈনাপত্য বোঝেন।"

এতে আপত্তি করলেন সিন্ধিয়া স্বয়ং। সদাশিব রাওকে ঠেলে রেখে তিনি সেনাপতি হবেন? এ তিনি কখনও পারবেন না। সদাশিবকে তিনি অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করেন।

বিতর্কের কোন মীমাংসা না করেই সভাভঙ্গ করলেন পেশোয়া।

যথাসময়ে আবদালির রণদুন্দুভি বেজে উঠল সিন্ধুনদের পূর্ব তীরে। হিন্দুবাহিনীও সেজে বেরুলো। যেমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন পেশোয়া, সেনাপতি হয়ে এলেন সদাশিব রাও ভাও।

সূরযমল এলেন দশ হাজার সৈন্য নিয়ে। যুদ্ধটা হিন্দুরা জিতবে, এ আশা তিনি করেন না, অকারণে বেশী সৈন্যক্ষয় করা কেন?

না, যুদ্ধে হিন্দুরা জয়লাভ করতে পারে না, এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই যুদ্ধে এলেন সূরযমল। যুদ্ধজয় সৈন্যেরা করে না, করে সেনাপতি। সদাশিবকে সেনাপতি করে আবদালির মত রণপণ্ডিতকে পরাস্ত করা অসম্ভব বলেই মনে করেন সূরযমল।

পানিপথে দুই বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সদাশিব রাও তাঁর ব্যূহরচনার পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন রাজাদের সমুখে।

লক্ষ সৈন্যের বাহিনীটাকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি। সংরক্ষিত সেনা বলে থাকবে না কিছু।

"বহুক্ষণ যদি যুদ্ধ চলে, বাহিনীর কোন অংশ যদি অবসন্ন হয়ে পড়ে, তার শক্তিবৃদ্ধি করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না?" —প্রশ্ন করেন সূরযমল।

"বহুক্ষণ যুদ্ধ চলতে পারে না। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই আবদালি পিছন ফিরে দৌড়োবে, দেখে নেবেন"—জবাব দেন সদাশিব। এবং জবাবটা রূঢ়ভাবেই দেন।

অতঃপর সূরযমল রণস্থল ত্যাগ করে চলে গেলেন তাঁর দশ হাজার জাঠ নিয়ে। জেনে শুনে সজ্ঞানে তিনি দশ হাজার জাঠের জীবন হাড়িকাঠে বলি দেবেন না।

পানিপথের সর্বধ্বংস এখানে আর বিশদ করে বর্ণনা না-ই বা করা গেল। কুরুক্ষেত্রের পরে হিন্দুজাতির এত রক্ত আর কোন রণক্ষেত্রে ঝরে নি। নেতা এবং সেনাপতিদের মধ্যে একটি প্রাণীও বেঁচে রইল না যুদ্ধের পরে।

সূরযমল যুদ্ধ করেননি, কিন্তু তিনিও বেঁচে রইলেন না। সেনাপতির উপর রোষবশতঃ তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে এসেছেন—এর জন্য তাঁর অন্তরে এল আত্মধিক্কার। একান্ত অপ্রয়োজনে তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈনিক নিয়ে একদিন আক্রমণ করলেন একটা বৃহৎ পাঠান সৈন্যদলকে। আত্মবলি দিলেন সেই যুদ্ধে।

ঐতিহাসিকেরা কেউ ভারতের প্লেটো, কেউ বা ভারতের ইউলিসিস্ বলেছেন সূরযমলকে। তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে দুর্ভাগিনী ভারতভূমি এমন এক কর্মবীরের সেবা থেকে বঞ্চিতা হল, যিনি বেঁচে থাকলে হয়ত বিক্রমাদিত্যের মত কীর্তিমান হতে পারতেন।

———

জরুরী ঘোষণা

এতদ্বারা "শুকতারা"র পাঠক-পাঠিকাদের এবং এজেণ্টদের জানানো যাইতেছে যে, কাগজের মূল্য এবং ছাপা খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী পৌষ মাস হইতে "শুকতারা"র দাম ·৭০ পয়সার স্থলে ·৮০ পয়সা হইবে।

* * গ্রাহকদের আরও জানানো যাইতেছে যে, আগামী ফাল্গুন, ১৩৭৮ সাল হইতে শুকতারা বার্ষিক চাঁদা সডাক ৮৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৪৲ টাকা হইবে।

—শুঃ সঃ

হাঁদা-ভোঁদার

দন্তশূল

জোরদার ছবি চলছে রে ভোঁদা! ফার্স্ট শোতেই মারতে হবে।
চিত্রঘর
গন্ধমাদন বিজয়
স্কুল

আমি এখন আর ইস্কুলে যাচ্ছিনা। ম্যাটিনিতে ঐ ছবিটা দেখতে যাবো। তুই সারকে বলবি যে আমার দাঁতের ব্যাথার জন্যে আমি ডেন্টিস্টের কাছে গেছি!
চিত্রঘর
এ খুব খারাপ হচ্ছে হাঁদা

ডেন্টিস্ট
সার, হাঁদা বলেছে যে ও আজ ডেন্টিস্টের কাছে যাবে তাই ও আজ ইস্কুলে আসবে না।
হিঃ হিঃ! এবার আমার কায়দা!

উওওঃ! একটা বড় দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তার বলেছে সারাদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে।
ডেন্টিস্ট
আহা বেচারা! তোকে আজ স্কুলে আসতে হবে না।

সারকে বেশ চমৎকার বোকা বানিয়েছি! এবারে সোজা সিনেমা হাউসের দিকে। ভোঁদার নিশ্চয়ই আমার মতো স্মার্ট আর চালাক হতে ইচ্ছে হচ্ছে!
ডেন্টিস্ট
একটা বাচ্ছা ছেলের দাঁত অমন ভাবে তোলে—বুদ্ধু কোথাকার! আবার নিজেকে দন্ত চিকিৎসক বলে পরিচয় দেন?
না মশাই! দাঁতের ডাক্তারবাবু হপ্তা খানেক আগে অন্য জায়গায় উঠে গেছেন আমরা বাড়ি ভাঙার লোক এ বাড়ি ভাঙছি!
ঠিকানা পরিবর্তন • ডাক্তারখানা এখান হইতে হাড়ভাঙা লেনে স্থানান্তরিত হইল।
ডেন্টিস্ট
এ্যাই মরেচে!
হতচ্ছাড়া বিটলে! আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী! এর জন্যে তোকে! ছুটির পর আরো দু ঘন্টা স্কুলে থাকতে হবে!
বিদ্যালয়
বেচারা হাঁদা!

উদ্‌ভ্রান্ত টারজান

সব্যসাচী

১০

শেষ পর্যন্ত লা-কে ওপার পাঠাতে সক্ষম হয়েছে টারজান। হয়েছে অনেক কষ্টে। রানীর ডাগর চোখের অঝোর অশ্রু তাকে প্রায় বিচলিত করে তুলেই ছিল, একটা বাধা না থাকলে ঠিক সে চলে যেত ওপারে। সে বাধাটা কিন্তু লেডী জেন গ্রেস্টোক নন, তাঁর কথা ত তিলমাত্র মনে নেই টারজানের। বাধাটা হল সেই ঝলমলে পাথরগুলি, যাদের স্মৃতি টারজানের মনে এখনও জাজ্জ্বল্যমান।

হীরে মণিমাণিক্যের দাম অনেক দুনিয়ার বাজারে, এটাই কি ওদের উপরে টারজানের আসক্তির কারণ? না, তা নয়। স্মৃতির সঙ্গে অর্থ নৈতিক হিসেবের ক্ষমতাও বোধহয় লোপ পেয়েছে ওর, তা নইলে বস্তা বস্তা সোনার বাট চোখে দেখেও সে উদাসীন হয়ে রইল কেমন করে সেদিন? আর্থিক ক্ষতি নয়, ইজ্জতের হানিই হীরের ব্যাপারে উত্তেজনা যোগাচ্ছে ওকে। একটা তুচ্ছ টারমাঙ্গানি কোথা থেকে আফ্রিকার বনে এসে বনের রাজাকে ঠকিয়ে যাবে? কক্ষণো না। টারজান তার মণিমাণিক্য উদ্ধার করবেই, দৃঢ় পণ তার। সঙ্গে সঙ্গে উচিত সাজাও দেবে চোরকে।

লা-কে সে বোঝাল—হাতে একটা গুরুতর কাজ রয়েছে, সেটা সেরেই সে ওপারে আসবে নিশ্চিত। লী এখন পূজারীদের নিয়ে চলে যাক, সূর্যদেবতার পূজো ত বন্ধ রয়েছে ওদিকে! দেবতা রেগে গেলে নতুন কিছু অনর্থ হওয়া আটক কী? আর সে অনর্থ হয়ত টারজানেরই ওপারে ফেরার পথে কাঁটা দেবে।

এই শেষের যুক্তিটাই অকাট্য মনে হল লা-র কাছে। সত্যিই ত, জন্মসূত্রে সে সূর্যদেবতার পূজারিণী, তাঁর চিহ্নিত করা দাসীই বলা যায়। তার প্রথম কর্তব্য হল দেবতারই প্রতি। তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলে টারজানকে সে পাবে কেমন করে? পেলেও হয়ত হারাতে হবে আবার।

চোখের জল ঝরতেই থাকল, লা চলে গেল ওপারে। তার পূজারী-গুলো কোয়াজের পরিণাম চাক্ষুষ দেখেছে, টারজানকে বিবেচনা করতে শিখেছে দৈবশক্তিধর পুরুষ বলে। তারা দাঁতে কুটো নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে—আর কখনও লা-এর বিয়ের ব্যাপারে কোন মতামত প্রকাশের গোস্তাকি তারা দেখাবে না।

এল বনস্পতিদের মাথা থেকে মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে।

লা চলে গেল। অনন্ত প্রতীক্ষা তার সমুখে। তবু তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন টারজানকে পাবেই সে পাবেই। সেই বিশ্বাসই সান্ত্বনা তার। যে-সান্ত্বনা সম্বল করে শতবর্ষ বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করতে পেরেছিলেন বৃন্দাবনের শ্রীরাধা।

লা-কে বিদায় দিয়ে দুঃখ একটু না পেয়েছিল টারজান, এমন নয়। কিন্তু সে দুঃখ ছাপিয়ে মুক্তির উল্লাস প্রবল হয়ে উঠল তার মনে। এইবার সে চোর সাহেবটার পিছু নিতে পারবে আবার। পথ ভুলবার লোক নয় টারজান। যেখান থেকে চুলুগ আর টুগলাট তাকে ডেকে এনেছিল লা-এর ব্যাপারে মাথা গলাবার জন্য, কয়েক দণ্ডের ভিতরেই সে সেইখানে এসে হাজির হল আবার। এল অবশ্য মাটির বুক দিয়ে হেঁটে নয়, বনস্পতিদের মাথা থেকে মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে।

সেখান থেকে আবার গন্ধ শুঁকে শুঁকে ওয়ার্পারের গতিপথ অনুসরণ। এইটিই এবার বিরক্তিকর ঠেকল বড়। একে গন্ধটা ক্ষীণ হতে হতে এখন প্রায় মিলিয়ে এসেছে। টারজানের

ছাড়া অন্য কারও নাকে সে গন্ধ মালুমই হত না। তার উপর সুঁড়িপথগুলো অরণ্যের এ-অংশে একান্তই দুর্গম। ওয়ার্পার কী করে এপথে হেঁটেছে, তা ভেবে পায় না টারজান।

যা হোক, গন্ধটা যেখানে নিয়ে এল টারজানকে, সেটা আবার এক গন্ধের সমুদ্র। কত রকমের কত মানুষের দেহবাস যে মিশে আছে সেখানে, তা হিসেব করাই দুঃসাধ্য। খানিকটা ফাঁকা জায়গা এখানে। সেখানে যে দুইচারি দিন আগেও ছাউনি ছিল একটা, তার সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বহু লোক বাস করছিল এখানে, ওয়ার্পারও অবশ্যই জুটেছিল তাদের সঙ্গে, যদিও আলাদা করে তার গন্ধ এখন আর মালুম পাওয়া অসম্ভব। তা হোক, গন্ধ ছাড়াই কাজ চলতে পারে এবার।

ওয়ার্পার এখানে জুটেছিল যখন, এখানকার লোকেদের সঙ্গেই সে গিয়েছে নিশ্চয়, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক। এখন টারজানের কাজ হল সেই লোকগুলোর গতিপথটা ধরে এগিয়ে যাওয়া। তা সে গতিপথ ত চোখের সামনেই পড়ে আছে। পাঁচ ছয়শো সৈন্যের একটা বাহিনী বনের ভিতর দিয়ে চলে গেলে হাজার রকম নিশানা ত তারা ফেলে যাবেই! সেইসব লক্ষ্য করে করে এগিয়ে চলল টারজান।

দিন দশেক বাদে তার মনে হলো—এ-অঞ্চলটা তার যেন চেনা ঠেকছে। এই ত এই সেদিন যেন সে ঘুরে গেল এদিকটা থেকে। চোর সাহেবটা তখন ছিল তার সঙ্গে! কতকগুলো কালো মানুষ মরে পড়েছিল এই দিকেই কোথায়! আর কতকগুলো জ্যান্ত কালমানুষ মাটি খুঁড়ে কী যে সব হলদে বাট পুঁতে ফেলল একটা কাঁটাঝোঁপে!

ধরেছে টারজান ঠিকই! মোরাকের সৈন্যের গতিপথ ধরে ধরে নিজেরই বিধ্বস্ত আবাদে ফিরে এসেছে সে। ওয়ার্পার বলেছে মোরাককে—"আসমতের ডেরায় আমি পরে নিয়ে যাব তোমাকে। আপাততঃ আমার সাথে অন্য এক জায়গায় চল ত! সেখানে মাটির তলায় চারশোখানা সোনার বাট পোঁতা আছে। আগে সেগুলি তুলে নেব আমরা, আধা-আধি বখরা, কী বল?"

মোরাক তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গিয়েছে। মনে মনে অবশ্য বলেছে—"দাঁড়াও ব্যাটা ফিরিঙ্গি, আধা-আধি পাইয়ে দিচ্ছি তোমায়, আগে বাটগুলো তুলি ত! বখরা যদি দিতে হয়, দেব আমার বাদশাকে। যার ফল্লে সিপাহসালার বনে যেতে পারি রাতারাতি।"

যা হোক, হাবসী সৈন্যদের গতিবেগ ত টারজানের তুলনায় শামুকেরই মত! মোরাক এসে ওয়ার্পারের নির্দেশমত মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে সবে, এমন সময়ে টারজান এসে অধিষ্ঠান করল সেই গাছেই, যার উপরে আগে একদিন ওয়ার্পারের সঙ্গেই সে বসেছিল। অধিষ্ঠান করেই কিন্তু সে সচকিত হয়ে উঠল।

সোনার বাট উঠছে মাটি থেকে, সেইজন্যই কি চাঞ্চল্য টারজানের? মোটেই না!

তার নাকে ভেসে এসেছে অন্য একটা গন্ধ—বহুদূর থেকে দ্রুত চলে আসছে আরও অনেক মানুষ, তারই গন্ধে। মোরাকের ফৌজের গন্ধ, আর এই নবাগতদের গায়ের গন্ধ, ঠিক এক নয়। এরা অন্য জাতের মানুষ।

কেন আসছে? কারা আসছে? টারজানের এ-সম্বন্ধে কৌতূহল যতই প্রবল হোক, সে কিন্তু তার দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রেখেছে ওয়ার্পারের উপরে। মাটি যেখানে খোঁড়া হচ্ছে, ঠিক সেইখানেই আছে ওয়ার্পার, মোরাকের পাশে দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের নজর হিংস্র হয়ে উঠল টারজানের। ঐ! ঐ সেই চোর! অকৃতজ্ঞ নরাধম! টারজান তোকে জীবন দিয়েছিল, তার বদলে তুই চুরি করেছিস তার পাথর। টারজান স্বভাবতঃ ক্ষমাশীল, কিন্তু বেইমানকে সে ক্ষমা করে না।

দূরের লোকগুলো ওদিকে নিকটে এসে পড়েছে। তাদের মিলিত পদশব্দ, স্পষ্টভাবে না হলেও, থেকে থেকে কানে ঢুকছে হাবসীদের। তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একজন দু'জন করে সৈনিকেরা শব্দটার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করল মোরাকের। মোরাক সোনার স্বপনে মশগুল, কান দিল না তাদের কথায়। তবে হুকুম একটা দিয়ে রাখল—"ফৌজ হুঁশিয়ার রহো! বন্দুক বাগিয়ে ধরে চারদিক পাহারা দাও! আদমি দেখলেই গুলি চালাবে বিনা ওজরে!"

ঝোপটাকে মাঝখানে রেখে চারদিকে চারটা লাইন রচনা করে ফেলল সিপাহীরা। সোনা উঠছে মাটি থেকে! আন্দাজ পেয়ে জনে জনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে এরা। মবলগ সোনা মিলে যায় যদি, সিপাহীরাও কেন বাদ যাবে তার বখরা থেকে। ভালভাবে না দেয় যদি মোরাক, কেড়ে নিতেও জানে এসব সিপাহী। কোথায় হাবসী মুলুক! কতদূরে বাদশা মেনেলেক! মোরাককে যদি সিপাহীরা জবাই করে ফেলে এই বনের মধ্যে, বাদশা আসবেন নাকি তাকে বাঁচাতে?

কিন্তু পদশব্দগুলো ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বহুলোক আসছে এদিকে, সন্দেহ নেই তাতে। কী এদের উদ্দেশ্য? এখানে ওদের কোন্ প্রয়োজন? মোরাক আদেশ, দিল—উঁচু গাছের মাথায় উঠে কয়েকজন সিপাহী লক্ষ্য করুক, কারা আসছে, কোন্ দিক থেকে আসছে, কত লোক আসছে, কী রকম লোক তারা, কী কী অস্ত্র আছে তাদের সঙ্গে।

অনেকগুলো গাছে অনেকগুলো লোক উঠে পড়ল তড়বড় করে। কিন্তু গুঁড়ি বেয়ে উঠে চারতলার মগডালে পৌঁছোনো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাতে সৈনিকেরা বৃক্ষারোহণের বিদ্যাটাতে পরিপক্ক নয় কেউই। তাদের ঢের আগে টারজান উঠে পড়েছে নিজের গাছের ব্রহ্মতালুতে, এক সেকেণ্ডের ভিতরে দেখতে পেয়েছে আগন্তুকদের।

আবাদের হাতার ভিতরেই ঢুকে পড়েছে তারা, আধ মাইল দূরেও নেই আর। দেখা তাদের যাচ্ছে না শুধু এই কারণে যে মাস তিনেক মানুষের শাসন না থাকার দরুন খোলা মাঠের জংলা ঘাস মাথা ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সেই রাক্ষসে ঘাসবনের ভিতরে যে দলটাকে দেখতে পেল টারজান, তাতে তিনশোর কম হবে না মানুষ।

এদিকে এক মজা, ঘাসবনে ঢোকার পর থেকে মানুষগুলোর পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। মোরাক সশব্দে হেসে বলল—"কই? কোথায় আওয়াজ? মানুষ না ছাই! যত ভীতু নিয়ে কারবার আমার। মানুষ না থাকলেও পায়ের শব্দ শুনতে পায়। আর শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছা যায়!"

কোথাও কোন আওয়াজ নেই। গাছে গাছে যে সব হাবসী উঠেছিল, তারাও ঘাসবনের ভিতরে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই মোরাকের ব্যঙ্গটা নিঃশব্দে পরিপাক করতেই তারা বাধ্য হল।

এদিকে মাটি থেকে বাট উঠছে সোনার। সমস্ত পলটনটা ঘিরে ধরেছে ঐ গর্ত। শৃঙ্খলাবোধ ভেসে গিয়েছে হাওয়ায়। মোরাক নিজেও এমন উত্তেজিত যে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য যে একটা চেষ্টা করা তার উচিত, তা মনেও পড়ছে না তার। মনে তার শুধু একটা চিন্তাই এখন, একটা বাটে কতখানি সোনা থাকা সম্ভব, বাটের সংখ্যা ঠিক কত, মোটের মাথায় কত সোনা সে দেশে নিয়ে যেতে পারবে, সিপাহীগুলোকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কী কী কিকির করা যেতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওয়ার্পার? ওকে সে হিসাবের ভিতরেই আনছে না। একটা ইশারার ওয়াস্তা! এক্ষুণি ওর ধড়টা থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা দারুণ ধাক্কা খেয়ে তার সোনার স্বপন টুটে গেল। আবার সেই পদশব্দ! এবার কানের কাছে একেবারে। বহু লোকের দ্রুতধাবনের শব্দ একসাথে। একটা আকাশ-ফাটানো রণোল্লাসের জিগির। অগুন্তি লোক ধেয়ে আসছে ঘাসবন থেকে বেরিয়ে। এই তারা রাইফেলের পাল্লার ভিতরে এসে পড়ল আর কি!

মোরাক হকচকিয়ে গিয়েছিল একমুহূর্ত, তার পরেই সে লাফিয়ে বেরিয়ে এল সৈনিক-দের ভিড় থাকে, তারস্বরে হুকুম জারি করতে লাগল—"হুঁশিয়ার জওয়ান! সারি বাঁধো! বন্দুক বাগাও! চালাও গুলি!"

কিন্তু জওয়ানেরা মোরাকের মত অত তাড়াতাড়ি কি আর চমক কাটিয়ে উঠে ধাতস্থ হতে পারে? হুঁশিয়ার হবে, তারপরে সারি বাঁধবে, তারপরে বন্দুক বাগাবে—অনেক দেরির কথা। বন্দুক সবাই নিজের নিজের হাতেই কি রেখেছে আর? বিশ পঁচিশটা একসাথে গাদা করে করে রেখেছে এখানে ওখানে।

ফলে ওরা বন্দুক বাগাবার আগেই আসমত শেখের দস্যুরা রাইফেলের পাল্লার ভিতরে এসে গেল। আর তাদের ধাবমান লাইনটা দুম্ করে থেমে পড়ে গুড়ুম গুড়ুম রবে ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি বৃষ্টি করতে লাগল হাবসীদের উপরে। গুলির জবাবে গুলি ছুঁড়বার আগেই অর্ধেক সৈনিক কুপোকাত হল হাবসী পলটনের।

তা হোক। হাবসী পলটনে লোক ছিল পাঁচশো। প্রায় অর্ধেক প্রথম ধাক্কায়ই কাবার হয়ে থাকে যদি, এখনও যারা অবশিষ্ট আছে, তারা সংখ্যায় ঐ দস্যুদের সমানই হবে। এতক্ষণে তারা সারিও বেঁধেছে, বন্দুকও বাগিয়েছে, এবারে আর গুলি চালাতে বাধা কী? সাহসে শৌর্যে হাবসীরা ত আর কাফ্রি দস্যুদের চাইতে খাটো নয়!

গলা টিপে ধরে সোজা তুলে নিয়ে গেল···
[পৃষ্ঠা ৭৬৪

দুটো দল তখন সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে। বন্দুক চলছে অতি-নিকট-পাল্লার মধ্যেই। ফলে একটা গুলিও ফসকাচ্ছে না। রক্তনদী বয়ে গেল দেখতে দেখতে। মানুষ পড়ছে ঠিক ঝড়ে ভাঙা কলাগাছের মত।

ওয়ার্পার কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেয়নি। যোগ দিলে প্রাণটা বজায় থাকার সম্ভাবনাও যতখানি, চলে যাওয়ার আশঙ্কাও ঠিক ততখানিই। যাকে বলে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। এ ঝুঁকির ভিতরে কোন বুদ্ধিমান লোক যায় কখনও?

হাবসীরা লড়ুক, ওয়ার্পার দুই কাঁধে দুখানা সোনার বাট তুলে নিল। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে সটান পিছু ফিরে সে চলল জঙ্গলমুখো। বাট দুখানা রইল সাথে, ঘরে নিয়ে যেতে পারে যদি, কাজ দেবে। না-ও পারে যদি, কোমরে পাথরের থলেটা ত আছে! ও দিয়ে ইওরোপে আমেরিকায় একটা রাজ্যখণ্ড কিনে নিতে পারবে সে।

জঙ্গলে সে সবে ঢুকেছে। পিছনে লড়াই চলছে, চলুক। ওদিকে ফিরে তাকাবার দরকার নেই। তার পথ সোজা সেই দিকে, যেদিক থেকে তাকে ধরে এনেছে মোরাক। পুবদিকে সমুদ্র। পুবদিকেই তার ভবিষ্যৎ।

জঙ্গলের ভিতরেই ঢুকেছে ওয়ার্পার। যাচ্ছে একটা গাছের তলা দিয়ে। হঠাৎ উপর থেকে একখানা হাত সাপের ফণার মত এসে পড়ল তার গলায়, আর সেই গলা টিপে ধরে সোজা তুলে নিয়ে গেল তাকে ঘননিবিড় পত্রপুঞ্জের ভিতরে।

এখন আসমতের কথায় ফিরে আসা যাক। একবার সে দস্যুদল পাঠিয়েছিল, জেনকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে কাজ দস্যুরা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সুসম্পন্ন করেছিল। এবার আবার সে আসে কেন? গোটা দলটা সঙ্গে নিয়ে নিজেই হানা দেয় কেন লুণ্ঠিত বিধ্বস্ত জনহীন আবাদে?

এ-প্রশ্নের উত্তর হল এই যে খবর পেয়েছে আসমত। চারশোখানা সোনার বাটের খবর।

ওয়ার্পার যখন ওপার যায় টারজানের অনুসরণ করে, তখন ওর সঙ্গে ছিল দস্যু একদল। আসমতের নির্দেশ ছিল—ঐ দস্যুদের সাহায্যে জেনকে হরণ করবে ওয়ার্পার। কিন্তু জেন-এর জন্য অপেক্ষা করা উচিত মনে হল না ওয়ার্পারের, সে সঙ্গীদের নিয়ে ওপার যাত্রা করল টারজানের সোনায় ভাগ বসাবার জন্য।

খনির ভিতর প্রথমে ঢুকেছিল টারজান, তার পরে তার ওয়াজিরিরা, আর সেই ওয়াজিরিদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ওয়ার্পারও। সাহেবের মতলব ছিল মহৎ। ওয়াজিরিরা সোনা নিয়ে বেরিয়ে আসুক, বনের ভিতর অপেক্ষায় থাকবে দস্যুরা, আচমকা আক্রমণে ওয়াজিরিদের ঘায়েল করে টারজানের কবল থেকে সোনাগুলো তারা ছিনিয়ে নেবে। নিজের লোকদের সে পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকবার নির্দেশ দিয়েছিল।

লুকিয়ে তারা ছিলও। সারা রাতই রইল। কিন্তু ওয়ার্পার ফিরল না। ওয়াজিরিরা ফিরল কিনা, রাতের অন্ধকারে তা টেরও পেলো না তারা। রাত গেল, ভোর হল। দস্যুরা গোটা দিনটা বসে রইল ওয়ার্পারের প্রত্যাশায়, এল না সে। তখন তারা ধরে নিল যে সাহেবের বিপদ ঘটেছে কিছু, হয়ত ওয়াজিরিদেরও ঘটেছে। তখন তাদের ভিতর কয়েকজন সাহসে ভর করে নগর প্রাচীর পর্যন্ত এগিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

সেখানে তারা দেখল—প্রাচীরটাই ধ্বসে পড়েছে। এখানে খনি কোথায় থাকতে পারে, আন্দাজ করতেই পারল না তারা। যেখানেই থাকুক, তার ভিতরে নামবার রাস্তা ত আর নেই! ওয়ার্পার নিশ্চয় আটক হয়ে রয়েছে সেই খনির গর্তে, তাকে বার করে আনার উপায়ও কিছু নেই। তখন তারা ফিরল।

কিন্তু ফিরবার মুখেই বিপদ ঘটল একটা। একেবারে একপাল সিংহের সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে গেল তারা। সব কয়টা দস্যুকে উদরস্থ করল সিংহেরা।

এরা যখন ফিরল না, তখন এদের খোঁজে আবার বেরুলো অন্য দস্যুরা। এদের বদলে দেখা পেল সিংহদের। এই হল তাদের কাল। সিংহগুলো সেই যে তাদের পিছু নিল, আর

ছাড়ল না। মানুষ ওরা তখন জনা ত্রিশ, সিংহ মাত্র ছয়টা। কিন্তু বন্দুক থাকা সত্ত্বেও ঐ ছয়টা পশুর মোকাবিলায় অক্ষম হল তারা। কারণ ?

কারণ, জংলীদের কুসংস্কার বড় বেশী। ওয়ার্পারের অন্তর্ধান আর তারই পিঠপিঠ এক ডজন দস্যুর শোচনীয় মৃত্যু তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে নিদারুণ। তাদের ধারণা হল—অশুভক্ষণে এ অভিযানে বেরিয়েছে তারা, এ থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ আর তারা ফিরবে না। ফলে, সিংহের ডাক শুনলেই তারা এখন কাঁপতে থাকে, বন্দুকের গুলি কখনও স্পর্শ করে না আততায়ী জানোয়ারকে।

প্রাণ নিয়ে তারা পালাচ্ছে নিজের দেশে, আর তাদের প্রাণ নেবার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করেছে ছয়টা সিংহ। প্রতিদিন দুটো তিনটে মানুষ যেতে লাগল ওদের পেটে।

অবশেষে মোটে যখন জনা-বারো অবশিষ্ট ওদের, তখন একদিন ওরা চমকে উঠে দেখল—ওদেরই প্রায় সমুখ দিয়ে সারি বেঁধে চলে যায় পঞ্চাশটা ওয়াজিরি। তাদের প্রত্যেকের মাথায় বস্তায় জড়ানো এক বোঝা সোনার বাট। দস্যুরা লুকিয়ে পড়ল ওয়াজিরিদের ভয়ে।

তবে এতদিনে সিংহের ভয় ঘুচল ওদের। জানোয়ারগুলো টারজানকে দেখতে পেয়েছে এক গাছের ডালে। টারজান ত ওয়ার্পারকে নিয়ে ওয়াজিরিদের পিছনে পিছনেই যাচ্ছিল!

এই সিংহযূথের যে দলপতি, তার কিছু অভিজ্ঞতা আছে টারজানের সম্পর্কে। এর আগে কয়েকবারই সে মহারণ্যে দেখতে পেয়েছে এই সিংহচর্ম-পরা মানুষকে, আর প্রতিবারই এর হাতে প্রাণ দিয়েছে তার সাথী স্যাঙ্গাৎ সেরা সেরা মহাসিংহ। অভিজ্ঞতা থেকেই আসে সতর্কতা। ঐ ছয়টা সিংহ ও-তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে গেল টারজানকে দেখেই।

এবার বারোটা দস্যু নিশ্চিন্দি হল নিজেদের সম্বন্ধে। কিন্তু পঞ্চাশটা ওয়াজিরিকে আক্রমণ করবে তারা কোন্ সাহসে ?- তারা পা চালিয়ে দিল আসমত শেখের ছাউনির উদ্দেশে, এবং সোনার খবর পেশ করল সর্দারের কাছে।

ওয়াজিরি তারা, টারজানেরই লোক অবশ্য। সোনা নিয়ে তারা অবশ্য টারজানেরই আবাদে এসেছে। আসমতকে কয়েকদিন দেরি করতে হল দলে আরও বেশী লোক টানবার জন্য। আবাদ বিধ্বস্ত দেখে ওয়াজিরিরা যদি সোনা ওখানে না নামিয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দলে নিজের ফৌজকে ভাগ করে ফেলবে আসমত। এক এক দল এক এক দিকে বেরিয়ে জঙ্গলটা চষে ফেলবে সোনার সন্ধানে।

তা, অত তকলিফ আর করতে হল না আসমতকে। সোনা আবাদেই আছে। তবে সোনা আর আসমতের মাঝে একটা ব্যবধান তৈরী করেছে ঐ উড়ে এসে জুড়ে বসা হাবসী-গুলো। এ উৎপাতগুলো এখানে কেন ?

এখানে কেন, তা আর জেনে যেতে পারল না আসমত শেখ। উৎপাতগুলোর গুলিতে সে নিজেই একসময় চিৎপাত হল লড়াইয়ের মাঠে।

"৺ক্ষেত্রমোহন দাস স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

সত্যি ঘটনা

সমীর পাল চৌধুরী

"আরে কাকা যে! কখন এলেন?" পড়ার ঘরে বাবার বন্ধু অনিন্দ্যকাকাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলুম। তার পাশে বসে আছে নাণ্টু। গল্প শুনছিল হয়ত।

কাকা আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। বললাম—"চিনতে পারছেন কাকা?"

"না, চশমা না হলে আমি ভাল দেখতে পাই না।" এই বলে কাকা খাপ থেকে চশমাটা বার করে পরলেন। তারপর আমার আপাদমস্তক নিরক্ষীণ করে বললেন, "তুই বিণ্টু না? এঃ ঘামে জামাটা চুপচুপে হয়ে গেছে দেখছি। জামা খুলে এখানে বস, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

নাণ্টু বলল, "যা গনগনে রোদ্দুর কাকা। তার মধ্যে দাদা দুমাইল ইস্কুল থেকে হেঁটে এসেছে—এটা কম বাহাদুরী কথা! দেখুন না ওর শরীর থেকে কিরকম ঘাম ঝরছে। একেবারে নেয়ে উঠেছে।"

কাকা জিজ্ঞেস করলেন, "এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল?"

আমি বললুম, "আজ হাফ ছুটি কাকা! ভারত গতকাল ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে বাবার জিতেছে তার জন্য।"

জামাটা খুলে কাকার মুখোমুখি বসলুম। কাকা বললেন, "তোর ভূতের গল্পটা পড়লুম।"

আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কেমন লাগল?"

কাকা মুখ বিকৃত করে বললেন, "ধেৎ ধেৎ। কি সব লিখেছিস, ওটাকে কি ভূতের গল্প বলে!"

"কি এমন ডিফেক্ট আছে যার জন্য গল্পটা খারাপ লাগল?"

"খুব একটা ডিফেক্ট নেই তবে তোর মামার বক্তব্যটা শুনে খারাপ লাগল। উনি একটা মরা দেখে প্রমাণ করে দিলেন ভূত নেই ভূভারতে।"

"মামা তো মরা দেখে ভূত প্রমাণ করেন নি, উনি···"

কাকা ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "তুই থাম, তোর মামাটার ভূত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান নেই। তাছাড়া জীবনে ভূতের দর্শন পেয়েছেন কিনা সন্দেহ! ওরা কি যে কোন লোককে দেখা দেয় রে, ওদের দর্শন পেতে গেলে অনেক সাধ্যিসাধনা করতে হয়। দুর্বল লোকের ধারে কাছে না ঘেঁষাই ভূতদের ধর্ম।"

নাণ্টু টিপ্পনী কাটল, "কাকা একি উল্টো কথা বলছেন! দুর্বল লোকের কাছে ভূত বেশী করে ঘেঁষে আর সাহসী লোককে···"

"মেলা কপচাস নি, বড্ড ডেঁপো হয়ে গিয়েছিস তাই না?" কাকা খিঁচিয়ে উঠলেন। তারপর চশমাটা ধুতির খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, "তোর মামাটা যাকে বলে একেবারে ভীতু। ভীতুরাই সাধারণতঃ গাঁজাখুরী গল্প পরিবেশনে ওস্তাদ হয়ে থাকে।"

মামার নিন্দে কোন্ ভাগ্নেই বা সহ্য করে! প্রতিবাদ করলুম, "মামার সম্বন্ধে কি সব আবোল-তাবোল বকছেন কাকা। মামার সম্বন্ধে আপনার চেয়েও আমরা ঢের বেশী জানি। তাঁর সাহসিকতার প্রমাণ অনেক পেয়েছি। সেদিক দিয়ে সাহসী মামাকে ভীতু বলা আপনার উচিত হয় নি।"

কাচ দুটো চকচকে করে ঘষে চশমাটা আবার চোখে লাগিয়ে ফিট করে বললেন, "খামখা রেগে যাচ্ছিস কেন? ভূত নেই একথা নিশ্চয় তোর মামা ভুল বলছেন—এটা তুই স্বীকার কর।"

নাণ্টু ন্যাকার মত প্রশ্ন করল, "কাকা, ভূত বলে কিছু আছে?"

কাকা শতরঞ্জিটাকে টেবিল মনে করে চাপড়িয়ে বললেন, "আলবাৎ আছে। মানুষ অপঘাতে মরলেই ভূত হয়—এটা তোদের নূতন করে শোনাতে হবে না। আমার জীবনে একবার ভূত-দর্শন হয়েছিল—সেই অভিজ্ঞতার কথাই তোদের বলব।"

আমি বললুম, "তাহলে আপনার ভূতের গল্পটা শুরু করুন।"

কাকা রেগেমেগে বললেন, "এটা গল্প নয় গাধা—সত্যি ঘটনা। যা দেখেছি তাই তোদের বলছি। এতে তোরা ছিটেফোঁটা মিথ্যে পাবি না। নাইনটি নাইন পার্সেণ্ট সত্য।"

গল্প শোনার আগ্রহে নাণ্টু জেঁকে বসল।

কাকা চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে খাপে পুরে ফেললেন। তারপর বলতে শুরু করলেন,—"আমি মার্টিন রেলের গার্ড ছিলুম তোরা তা জানিস?"

নাণ্টু বলে উঠল, "মার্টিন রেল বলতে ছোট রেল তো? আমরা ওতে চড়েছি।"

কাকা বললেন, "হ্যাঁ, ছোট রেলই বটে। সব দিক দিয়ে ছোট, ছোট ছোট লাইন, ছোট ছোট বগি। গতিও ছোট, ঘণ্টায় চোদ্দ পনেরো মাইল। দূর থেকে দেখলে মনে করবি দেশলাইয়ের সারি চলেছে।"

আমি বললুম, "দুঃখের বিষয় গত বছর ওই রেল বন্ধ হয়ে গেছে।"

কাকা ম্লান হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক গতবছর ওটা বন্ধ হয়ে গেল, আমাদের দুর্ভোগের সীমা নেই। এখন যাহোক কয়েকটা টিউশানি করে জীবিকা অর্জন করছি।"

কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে নাণ্টু অধৈর্য হয়ে বলল, "কাকা আপনার সত্যিকারের কাহিনীটা আরম্ভ করুন।"

কাকা আরম্ভ করলেন, "তাহলে শোন। টুয়েন্টি সেভেন আপে আমার ডিউটি পড়ল।

রাত্রিরের ট্রেন। নতুন গার্ড হওয়ার পর থেকে এই প্রথম রাত্তিরের ট্রেনে ডিউটি। সঙ্গে হারিকেন নিলুম, আর ছিল ডিউটির জন্য হ্যাণ্ড সিগন্যাল ল্যাম্প সংক্ষেপে বলি এইচ, এস, ল্যাম্প। ট্রেন ছেড়ে দিলে হারিকেন জ্বালিয়ে নভেল পড়তে শুরু করলুম।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আচ্ছা কাকা হারিকেন জ্বালিয়ে নভেল পড়ছিলেন কেন? গাড়িতে কি আলো ছিল না?"

কাকা বললেন, "ঐ রেলে ঐটাই নিয়ম। কোন গাড়িতেই আলো দেখতে পাবি না। জনসাধারণের সম্পত্তি তাই যাত্রীরা না বলেই নিয়ে যায়। সারা গাড়িটাই থাকে অন্ধকার। অন্ধকারে ভ্রমণ করে করে যাত্রীদের কিরকম অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।"

"যাত্রীরা সব বকতপস্বী তাই না?" নাণ্টু বলল।

"তা বলতে। যাক সে কথা, আমি তো গার্ড গাড়িতে একলা। নন্দী চেকার কামরায় কামরায় টিকিট চেক করছেন আমার টর্চলাইটটা নিয়ে। ট্রেন অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে গেছে তবুও তার আমার কামরায় ফিরে আসার নাম নেই। এদিকে উপন্যাসের অর্ধেকটা শেষ হতে বাকী।"

নাণ্টু জিজ্ঞেস করল, "আপনি গাড়িতে উপন্যাস পড়েই কাটান, ডিউটির দিকে নজর দেন না?"

কাকা বললেন, "আমাকে বলতে দে। এরকম মাঝে মাঝে টিপ্পনী কেটে কাহিনীটা গুলিয়ে দিসনি।"

আমি বললুম, "ওর কথায় কান দেবেন না কাকা। আপনি বলে যান।" তারপর নাণ্টুর উদ্দেশ্যে বললুম, "চুপ করে থাকতে পারিস না নাণ্টু, কাকার গল্পে মাঝে মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা কি তোর ব্যাড হ্যাবিটে দাঁড়িয়ে গেছে?"

কাকা আমার দিকে কটমট করে চাইলেন। বুঝলুম এরূপ তাকানোর অর্থটা।

"গল্প নয় বুদ্ধু, এটা সত্যি ঘটনা। তারপর শোন, উপন্যাসের একটি ইনটারেস্টিং মুহূর্তে এমনই মশগুল ছিলুম যে কখন ট্রেনটা আউটার সিগন্যালের কাছে দাঁড়াল বুঝতেই পারি নি। খেয়াল হল দমকা হাওয়ায় হারিকেনটা দপ করে নিভে যেতে। বিরক্তিতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম—সিগন্যাল ল্যাম্পটা লাল। পূর্ণিমার রাত। চারিদিকে ঢলঢলে জ্যোৎস্না। কাছেই কানা নদী। তার জলে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। ধারে কাছে কোন জনবসতি নেই। ফাঁকা চতুর্দিক, সাড়াশব্দ কোথাও নেই। এ এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। একলা থাকতে কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ করছি। নদীর মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়ায় প্রাণটা জুড়িয়ে দিচ্ছে। পরক্ষণেই দুচোখে যত রাজ্যের ঘুম ছিল নেমে এল এক এক করে। কামরার ভিতর ঠক করে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হতেই আমার ঘুম টুটে গেল। দেখলুম

একটা লোক আমার কামরার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে চিনতে পারলুম না। বাইরেও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে। অজানা আশঙ্কায় গাটা ছমছম করে উঠল। চোর গুণ্ডাও তো হতে পারে?"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ঝলমলে চাঁদের আলোয় ঘুটঘুটে অন্ধকার এল কোথা থেকে?"

"আরে বুদ্ধু কোথাকার, এটুকু তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে—একখণ্ড মেঘ চাঁদকে আড়াল করলেই চারিদিকটা অন্ধকার হয়ে যায়।"

নাণ্টু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তারপর কি হল?"

'কি রে অনিন্দ্য, কেমন আছিস?'

"তারপর লোকটি সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে খানিকটা হেসে বলল, 'কি রে অনিন্দ্য, কেমন আছিস?' চেনা গলা বলে মনে হল। মেঘ সরে গেছে চাঁদের সুমুখ থেকে। এবার চাঁদের আলোয় স্পষ্ট চিনলুম লোকটাকে। প্রভাস। আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। বর্ধমানে আমি আর ও ছেলেবেলা থেকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলাম। পড়তুম এক ক্লাসে। যত বড় হতে থাকে লেখাপড়ার প্রতি ওর বিরাগ বিতৃষ্ণা বেড়ে ওঠে। মনটা ওর চিরদিনই ভবঘুরে। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'লেখাপড়া করে কি হবে, চাকরি কেউ দেবে?' লেখপড়ার বিষয় কিছু বলতে গেলে ও তেড়ে আসে—'বেশী জ্ঞান দিতে আসিস না।' তারপর দম করে ইস্কুল আসা বন্ধ করে দিল। একদিন সে সত্যি সত্যিই দেশ ছেড়ে চলে গেল—কোথায় না কি কাজ পেয়েছে। দীর্ঘ পনেরো বছর পর এই লাইনে গার্ড হয়ে এসে দেখলুম প্রভাসকে। ট্রেনে ট্রেনে চা বিক্রি করে।

"প্রভাস জিজ্ঞেস করল, 'কিরে কি ভাবছিস?' আমি বললুম, 'কই কিছু না তো!

তোকে দিন পনেরো হল দেখতে পাই না কেন ? কোথায় ছিলিস ?' প্রভাস বলল, 'কয়েকদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগেছি। পরশু থেকে কাজ করছি।' জিজ্ঞেস করলুম, 'তোর শরীর কেমন ?' প্রভাস বলল, 'ভাল, চা খাবি ?' আমি বললুম, 'দে, খাওয়া যাক। গলাটা যা শুকিয়ে খটখট করছে।' প্রভাস কেটলি থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিল এক ভাঁড়। চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, 'আরে ছ্যা ছ্যা, কি চা দিয়েছিস, একেবারে বরফ হয়ে গেছে।' ও ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে হেসে বলল, 'চা তো দূরের কথা মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমার দোষ কি বল, হতচ্ছাড়া ঐ বাতাসটার জন্য চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।' আমি বললুম, 'এই ঠাণ্ডা চা খাইয়ে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছিস।' ওর তরফ থেকে কোন উত্তর পেলুম না। চারিদিকে বিরাজ করছে এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। চা-এর ভাঁড়টা ফেলে দিলুম। নিস্তব্ধতাকে খানখান করে ভাঁড়টা ঠকাস করে শব্দ করে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নির্জনতার মধ্যে ঠকাস শব্দটা শুনে কেন জানি না আমার বুকটা ধকধক করে উঠল।

"প্রভাস বলল, 'একলা বসে থাকতে তোর ভয় লাগছিল না।' আমি বললুম, 'ভয়! ভয় বলতে ভূতের ভয় বলছিস ?' ও বলল, 'হ্যাঁ, এ সময়টাতে ভূতের ভয় ছাড়া আর কি থাকতে পারে বল ?' আমি বললুম, 'ভূতের ভয় আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি। ভূত দেখার জন্য কত তপস্যি করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত ভূতের দেখা পেলুম না।' ও হেসে বলল, 'ঘাবড়িও না বৎস। ভূত-দর্শন তোমার হবেই, শিষ্যের তপস্যা কি বিফলে যায়।'

"গাড়ি ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, সিগন্যাল ল্যাম্প নীল। গাড়ির গতি বেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। প্রভাস বলল, 'এবার তবে নামি।' আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'এখানে নামছিস কেন ? স্টেশন এলে নামবি। বস না, তোর সঙ্গে ভূত নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।' শুনল না আমার কথা। 'পরে একদিন হবে'—এই বলে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। পরক্ষণেই গাড়িটার তলা থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ ঘ্যাঁড় ঘ্যাঁড় শব্দ ভেসে এল। শঙ্কিত হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, ওর দেখা পেলুম না। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে কে জানে! আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম একরাশ কালো কুচকুচে মেঘ পূর্ণিমার পূর্ণাঙ্গ চাঁদকে ঢেকে রেখেছে। আমার মানসপটেও কে যেন একরাশ কালো কালি ঢেলে দিয়েছে বলে মনে হল। মুন্সিরহাট স্টেশনে ট্রেন থামল। মিনিট দুই থামে, ছোকরা পয়েণ্টসম্যান যদু লাইন ক্লিয়ারটা হাতে দিয়ে বলল, 'বাবু লাইন ক্লিয়ার নিন।'

"কি যেন একটা চিন্তায় মগ্ন ছিলুম। সম্বিৎ ফিরে পেলুম যদুর কথায়। যদুর চেহারা দেখে আশ্চর্য হলুম। 'হ্যাঁরে যদু তোর এরকম চেহারা কেন ?' ও বলল, 'কেন হয়েছে সেটাই বলছি। ঘণ্টা চার-পাঁচ আগে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে জানেন ?' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় ?' যদু

বলল, 'আপ আউটার সিগন্যালের কাছে। চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে এক ব্যাটা ট্রেনের তলায় গিয়ে পড়ল—তারপর শেষ। স্টেশন মাস্টার যত ঝুট-ঝামেলা আমার উপর চাপান। তেনার অর্ডার—যদু অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা থানায় দিয়ে এস। নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠিয়ে সেই রোদ্দুরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলুম চার মাইল দূরের থানায় জানিয়ে আসতে। কিছুক্ষণ আগে ডিউটি ধরলুম।' আমি বললুম, 'সে তো বুঝতেই পারছি যদু, তোর শরীরের উপর দিয়ে জোর ঝড় বয়ে গেছে।' যদু বলল, 'ডেড বডিটা দেখবেন বাবু? ১ নম্বর প্লাটফর্মে পড়ে আছে, কিছুক্ষণ পরেই পোস্টমর্টেমে যাবে।' আমি বললুম, 'দরকার নেই যদু। কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটাই তোর কাছে জানতে চাই?' যদু বলল, 'চা-ওয়ালা প্রভাসকে চেনেন বাবু? সে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

"প্রভাস! প্রভাসের নামটা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ আগে ঠিক অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় প্রভাসের প্রেতাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল! কাথাটা ভাবতেই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথাটা। বুকের প্যালপিটেসন আরও বেড়ে উঠল। ধপাস করে বসে পড়লুম কামরার বেঞ্চিটায়। 'কি হল বাবু! ট্রেন ছাড়বেন না?' যদু বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল। আমি মনের ভাব গোপন রেখে বললুম, 'না কিছু হয়নি, তুই এখন যা।' ও চলে গেল। অসার হয়ে বসে রইলুম। নন্দী চেকার গার্ডকামরায় উঠেই বলল, 'অসার হয়ে বসে আছেন কেন? ট্রেন ছাড়ার নির্দেশ দিন। ওদিকে ড্রাইভার র‍্যানডাম হুইসেল বাজাচ্ছে।' কোন রকমে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এইস, এস, ল্যাম্প নাড়িয়ে ড্রাইভারকে সংকেত জানালুম ট্রেন ছাড়তে। ট্রেন ছাড়ল। আমার কাহিনীরও শেষ হল।"

নাণ্টু বলল, "ভূতের মুখে ভূত নাম!" কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে কাকা নাণ্টুর দিকে চাইলেন।

আমি বললুম, "কাকা নিশ্চয় পয়েণ্টস্‌ম্যানের কাছ থেকে প্রভাসের নামটা শুনেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এটা গোপন রেখে মিথ্যা কথাটা বললেন। আপনার দোষই বা কী! ভৌতিক গল্পের শুরুতেই স্বীকার করেছেন—ওয়ান পার্সেণ্ট মিথ্যা কথা বলবেন—তাই আপনাকে দোষ দিচ্ছি না।"

আর থাকি? সোজা দরজা ডিঙ্গিয়ে দে ছুট—কাকার রামগাঁট্টার ভয়ে।

"৺ক্ষেত্রমোহন দাস স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

প্রতিশোধ

সুজাতা সেনগুপ্তা

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ। রহস্যময় স্বপ্নে ভরা দেশ। বিদেশে প্রচলিত আছে এই দেশ হল ভূত, পেত্নী আর সাপের রাজত্ব। যত রকম তান্ত্রিক আর যোগীরা এই দেশে বাস করেন। এক কথায় অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ। এদেশ যত আজগুবী কাণ্ড কারখানায় ভরা। এই দেশে আমরা বাস করি। অতএব বিদেশের চোখে আমরাও এই ধরনের কিম্ভূত মানুষ যাদের অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু তেইশ চব্বিশ বছর আগে আমাদের এই দেশ অবিভক্ত ছিল। সেই সময় চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রামে এমন একটি ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটেছিল যার ব্যাখ্যা আমরাও করতে পারি না। এই জেলাটি এখন পূর্ব বাংলার ভাগে পড়েছে।

সে সময় আমিও জন্মগ্রহণ করিনি। আমার বাবা তখন বেশ ছোট। আমি এই গল্পটি শুনি আমার ঠাকুমার কাছে। আমার ঠাকুরর্দা তখন সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দেশ থেকে কর্মোপলক্ষে সেখানে বদলী হয়েছেন। সঙ্গে একটি বিশ্বাসী ভৃত্য, যে তাঁকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। দিন কেটে যায় বহাল তবিয়তে। এমন সময় হঠাৎ দেখা দিল প্লেগ মহামারী রূপে। সবাই সন্ত্রস্ত। ঠাকুমা নিজের ছেলেদের নিয়ে সাবধানে দিন কাটাতেন। রোজই খবর আসত মৃত্যুর। এমনকি সময় সময় ডাক্তারও পাওয়া যেত না। এমন সময় সেই অতি পুরাতন ভৃত্য, মনে করা যাক তার নাম শিবু, তার প্লেগ হল। ডাক্তারবাবু এসে দেখাশোনা করতে লাগলেন। তাঁর কথামত শিবুকে আলাদা ঘরে রাখা হল আর সব সময় দেখাশোনার জন্য একটি চাকরও রাখা হল। ঠাকুমা নিজের ছেলেদের এবং নিজেদের ছোঁয়াচের ভয়ে আলাদা হয়ে রইলেন, তবে রোজ সকালে ও বিকালে শিবুর ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে লাগলেন ঠাকুমা ও ঠাকুর্দা। দু'তিন দিন পর শিবুকে খুব সাবধানে রাখার জন্যই হোক বা ঠিকমত ওষুধের জন্যই হোক শিবু প্রায় সেরে উঠতে লাগল। ডাক্তারবাবু বললেন আর ভয় নেই। এমন সময় একদিন ভোরে দেখা গেল শিবু তার ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আর তার জন্য নবনিযুক্ত চাকরটিও বেপাত্তা। শিবুর এই হঠাৎ মৃত্যু সকলকে অবাক্ করে দিল যত না তত বেশী মন খারাপ করল। দাদু ওর যথাবিহিত সৎকারের ব্যবস্থা করলেন।

পরের দিন দুপুরে ঠাকুমা খেয়ে দেয়ে এসে শুয়েছেন, সবে তন্দ্রা এসেছে হঠাৎ যেন দেখেন শিবু দরজায় দাঁড়িয়ে। ঠাকুমা ভাবলেন মনের ভুল। কিন্তু তার পরের দিন, তারও

পরের দিন একইভাবে শিবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাকুমা নিঃসন্দেহ হলেন। দাদুকে বললেন। দাদু প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। তারপর নিজে একদিন ঐ সময় ঘরে থেকে দেখলেন। সত্যিই শিবু দাঁড়িয়ে আছে। দাদু খুবই সাহসী ছিলেন, তাঁর হঠাৎ কেন না জানি মনে হল শিবু কিছু জানাতে চায়। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে শিবু কিছু বলবি?" এবারে শিবুর ছায়া শরীরে কথা ফুটল, বলল, "দাদাবাবু তোমার নতুন চাকরটার জন্যই আমার প্রাণ গেল। ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারে ও আমার বুকে চেপে বসল আর তাতেই আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ওর বাড়ি কোথায় বল তো?" দাদু বললেন, "ওর দেশ ছাপরা জেলায় বলেছিল।" একথা জানবার পরই শিবুর ছায়া মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য সে আর কোনও দিন আসেনি বা কারও কোন ক্ষতি করেনি। দাদু অবশ্য এরপর ওর নামে গয়ায় পিণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

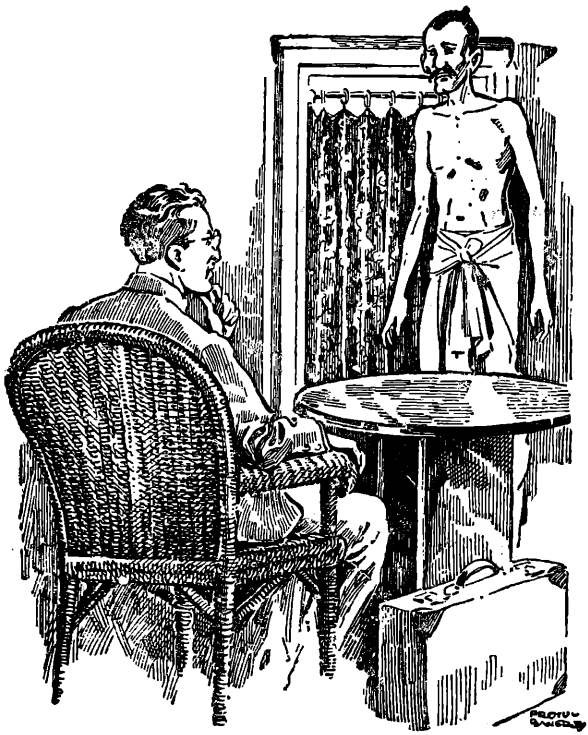

সত্যিই শিবু দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। দাদু একদিন কাছারিতে বসে আছেন এমন সময় একজন অন্ধ লোক দাদুর কাছে এলো। দাদুর মনে ছিল না সেইই পরিচয় দিয়ে বলল, "আমি শিবুর জন্য নিযুক্ত সেই চাকর, তার মৃত্যুর কারণ আমিই। সেই পাপে আমার চোখ হারিয়েছি।" এখন দাদুর কাছে সে আশ্রয় চায়। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, একদিন যখন সে মাঠে কাজ করছিল সেই সময় হঠাৎ এক ধুলোর ঝড় (যাকে আঁধি বলা হয়) ওঠে। কিন্তু সেই ধুলোর ঝড় আর কারোর ক্ষতি করেনি শুধু ওরই চোখ ধুলোর ঝাপটা লেগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে সে চোখ হারায়। আর রাত্রে শিবুর প্রেতাত্মা এসে তাকে বলে যায় এটা তারই প্রতিশোধ। এরপর দাদু যতদিন বেঁচে ছিলেন ঐ অন্ধ ভৃত্য ততদিন দাদুর সেবা করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই প্রেতাত্মার প্রতিশোধ! এর পরও কি বলব যে ভূত নেই?

———

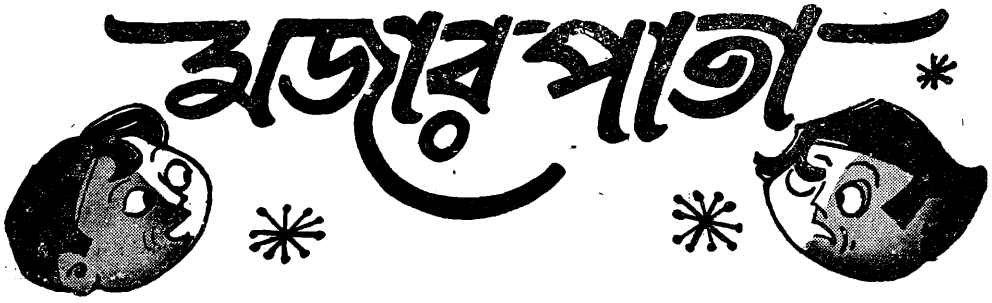

নতুন ধাঁধা

১ চুপচাপ থাকতেই মাথা দিলে কেটে—
চারিদিক চিৎকারে পড়ল যে ফেটে।
লেজ কাটতেই সব জল হয়ে গেল,
তিনটি আখরে গড়া কি নাম বল।

—উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া।

২। আমার মস্তক 'পরে চরণ রাখিলে,
চিরঅবাঞ্ছিত হয়ে রহিনু ভূতলে।

—সুপ্রকাশ আচার্য, পাড়া।

৩। শেষ ছেড়ে ক'টা পেল?
প্রথম ছেড়ে মাথায় এল।

—পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। কুশল। ২। বলয়। ৩। গায়েব।

গত মাসের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—সোমনাথ, শঙ্কর ও শম্পা দত্ত—পি. ডব্লু. ডি. রোড; লিলি, জীবানন্দ, নবীন, পিন্টু ও রূপা—কড়েয়া রোড; রাম, বাচ্চু, আশা, অপর্ণা ও বুড়ী—রামকৃষ্ণ বাগচী লেন; ঝুনু, টুনু, মানু, বাবুয়া, অভীশ ও রাজেশ খান্না—রাষ্ট্রগুরু এভেনিউ।

২৪ পরগনা—নমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; মৌসুমী, পার্থ, চৈতালী ও মিতালী বসু—বারাসত; শ্যামল, বাদল, শীলা, রুবী, মারা ও বেবী—ইছাপুর; বিশ্বজিৎ ও চিরশ্রী ব্যানার্জী—ইছাপুর।

বর্ধমান—রাণা, মধুমিতা ও কল্যাণী দাশগুপ্তা—ধাদকা।

বাঁকুড়া—চৈতালী ও অভীক দে—বিষ্ণুপুর।

উড়িষ্যা—অরুণিমা ও পিয়ালী বেরা—ভুবনেশ্বর।

গত আশ্বিন মাসের ধাঁধার বাকি উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য—বিবেকানন্দ-নগর; মা, মীনা, অনন্যা ও শুভাশীষ বসু—শশীভূষণ চ্যাটার্জী লেন।

২৪ পরগনা—ভেঁপু, পিকু, টপা, সেজদি, মা, বাবা প্রভৃতি—ঘোলা।

মেদিনীপুর—গোপচাঁদ, সুনীত, শানতি, বাসবী প্রভৃতি—মহিষাদল।

পুরুলিয়া—শ্রীজীব আচার্য ও শর্বরী মুখার্জী—পাড়া; দিলীপ, তরুণ, তুষার ও তুহিন মুখোপাধ্যায়—পুরুলিয়া; অরবিন্দ, বিধান, তপন, পার্থপ্রতিম প্রভৃতি—ঝাপড়া; পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা ও তপেশ মাজী—ছড়রা; রুবী, বাবন, ছোটকু, বেবী, বাসু, বিউটি প্রভৃতি—মুনসেফডাঙা; দীপক, আলোক ও বিশ্বনাথ—ঝাঁপড়া; মা, বাবা, বড়ন, ছোটন, ছোড়দি ও শান্তনু—রঘুনাথপুর; দিলীপকুমার চৌধুরী—মধুপুর; বেবী, বাবলু, মনু ও চিনু—রঘুনাথপুর।

বীরভূম—মা, বাবা, সুপ্রিয়া, সুদেষ্ণা, সুকৃতি ও কমলপ্রিয়া বিশ্বাস—শান্তিনিকেতন।

বিহার—মা, বৈশাখী, বাবু প্রভৃতি—রাঁচী; প্রতিভা, তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৩; মা, বাবা, অতনু, সুতনু, সুজাতা ও সুতপা চৌধুরী—জামসেদপুর-৭; তাতা, মুন্না, বুম্বা ও শুভেন্দু চট্টরাজ—কদমা; দেবব্রত মৈত্র, পিন্টু, খুকু, মৌ, কণা প্রভৃতি—পাটনা-১; টোটন, বুবু, টুলু ও সুব্রত চট্টরাজ—কদমা; টুটুল, হিজু, ভুচুয়া, বন্যা, মা ও বাবা—বারহারোয়া; সনৎ, চিত্র, পুতুল, তুতুল, বুবুল ও টুবুল—চিরকুণ্ডা; পীযূষ, পিনাকী, স্নিগ্ধা ও স্নিগ্ধা—দণ্ডঘর; স্বপ্না, অপর্ণা, অনন্যা, শান্তনু ও সৌম্য—জামসেদপুর-৪; ধীরেন, শুভেন্দু, দিব্যেন্দু, সিপ্রা ও শুভ্রা তলাপাত্র—জামসেদপুর; নিমু, মিনা, মিলা, লতিকা, অপর্ণা ও বিজয় দত্ত—নির্মাচেটী; বাবা, মা, মল্লিকা, বিশ্বজিৎ, শিখা ও কল্যাণ—হাজারীবাগ।

আসাম—কলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মারিয়ানী।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন বীণা ও খোকা—বিলাসপুর; মা, সুবীর, জ্যোতি, দীপ্তি, উৎপল, জয়ন্ত ও প্রশান্ত—রায়পুর।

উত্তরপ্রদেশ—জয়ব্রত, কুণাল, মা ও বাবা—এলাহাবাদ।

নতুন দিল্লী—শিবদাস, দুর্গাদাস ও শর্মিলা লাহিড়ী—সরোজিনীনগর।

ত্রিপুরা—সমর্পিতা, নিবেদিতা, সুচরিতা, নবনীতা, দেবজ্যোতি প্রভৃতি—অরুন্ধতিনগর।

কলিকাতা দেশবন্ধুনগর হইতে শ্রীমতী রত্না সেনগুপ্ত তাঁর স্বর্গগত বড় ভাই সুনির্মল সেনগুপ্তের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"সুনির্মল সেনগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু
"মাতৃভক্তি"

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ: ২৯শে পৌষ।
প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী ফাল্গুন সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

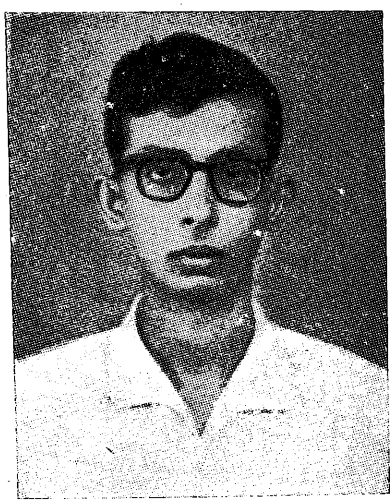

জন্ম: ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪৯
মৃত্যু: ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৮

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা**

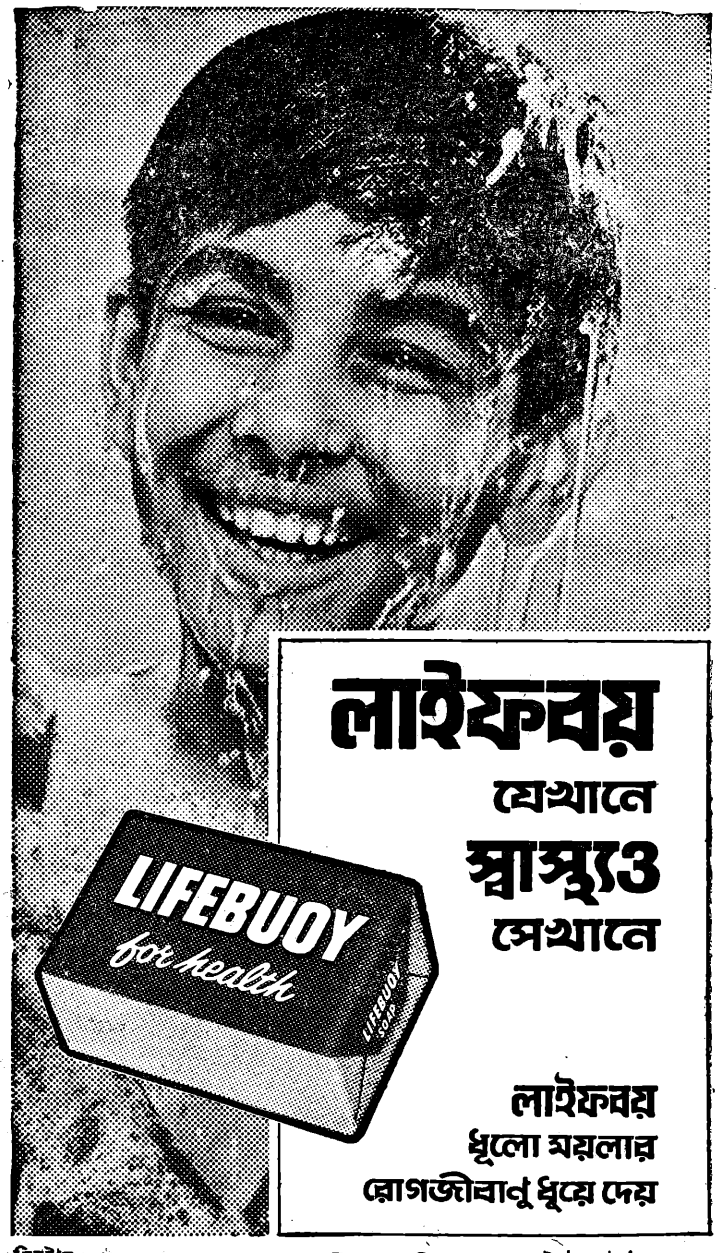

লিনটাস-L.61-77 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

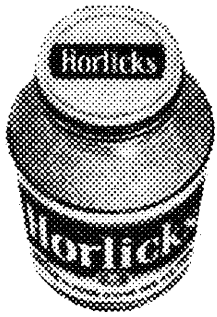

হরলিক্স-এর মতই পুষ্টিতে ভরপুর

ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট

আমরা বিশ্ববিখ্যাত হরলিক্স-এর সব পুষ্টিকর উপাদানের সঙ্গে আরও অনেক পুষ্টিকর জিনিস মিশিয়ে আমাদের বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী করেছি এই ব্রিটানিয়া হরলিক্স বিস্কুট—যেমন চমৎকার সুস্বাদু আর মুচমুচে, তেমনি পুষ্টিতে ভরপুর। বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে তো ভালই—সারা পরিবারের সকলের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর।

ব্রিটানিয়া হরলিক্স সত্যিই বিস্কুটের মত বিস্কুট।

ভারতের সেরা বিস্কুট ব্রিটানিয়া

BBC 2764 A

shilpi hpma 51/71 ben

শিশুরা সব
জমাতে শেখো
ডোনাল্ড ডাককে পয়সা দিয়ে
ফলটা কি হয় তোমরা দেখো !

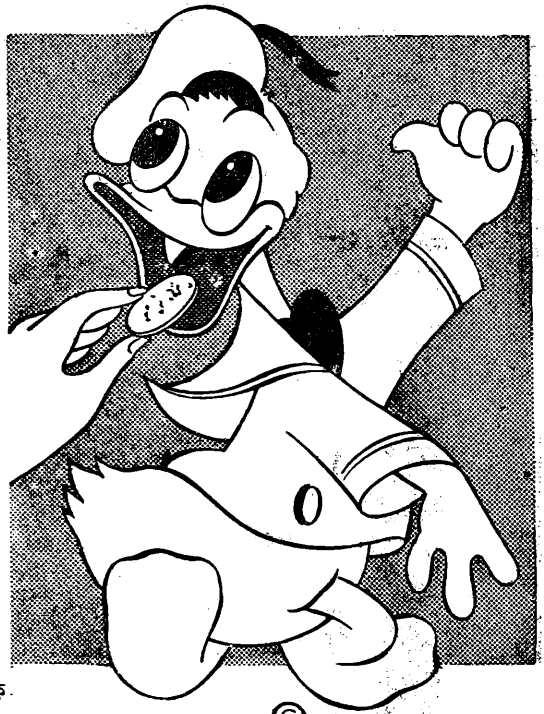

এসব ডিজনি
সেভিংস বুকের
মধ্যে কোনটি পছন্দ ?

একটি ডিজনি সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুললে নানা-রকম লোভনীয় ডোনাল্ড ডাক সেভিংস বক্সের মধ্যে যে-কোন একটি বাক্স আর তার সঙ্গে একটি লোভনীয় সচিত্র ডিজনি সেভিংস পাশবুক পাওয়া যায়।

ডিজনি সেভিংস অ্যাকাউন্টের টাকা বার্ষিক ৪% হার সুদে বাড়তে থাকে।

আরও কিছু জানতে হ'লে আসুন

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

অমৃতসর, বোম্বাই, কলিকাতা, কালিকট,
কোচিন, দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ,
নিউ দিল্লী, শাস্তাজী, (ভাস্কো ডা গামা)

everest/122b/PP ben

পি. সি. মজুমদার এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

২১/১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

এবছরের প্রাইমারী স্কুলের কয়েকখানি সেরা বই !!

● শিশু শ্রেণী ●

১। **সরল বর্ণবোধ**—মধুসূদন দেব ০·৬০
২। **নিজে শেখ অ, আ**—ননী আইচ ১·০০
৩। **খুশীর পড়া**—মধুসূদন দেব ১·৫০

ধারাপাত ও অঙ্ক ঃ

১। **ছবি ছড়ায় ধারাপাত**—মধুসূদন দেব ০·৮০
২। **বুনিয়াদী ধারাপাত**— ঐ ০·৮০
৩। **গুণতে মজা**—মধুসূদন মজুমদার ১·৫০

আদর্শ লিপি ঃ

আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয়
—অরুণকুমার ১·০০

● প্রথম শ্রেণী ●

১। **সোনার কমল** (১ম)—মধুসূদন দেব ১·০০
২। **আলোকমালা** (১ম)—অরুণকুমার ১·০০
৩। **ছবি ও পড়া** (১ম)—মধুসূদন দেব ১·০০
৪। **কচি পাতা**—তপতীরানী ১·২০

দ্রুত পঠন ঃ

রঙ বেরং—আরতি বসু ১·০০

গণিত ঃ

১। **আধুনিক গণিত শিক্ষা** (১ম)
—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৩০
২। **নূতন দশমিক গণিত** (১ম)
—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৩০

স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঃ

বুনিয়াদী স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা
(১ম)—ডাঃ সরসী চট্টোপাধ্যায় ০·৮০

ইংরাজী ঃ

ছোটদের A. B. C.
—ননীগোপাল আইচ ১·০০

● দ্বিতীয় শ্রেণী ●

১। **সোনার কমল** (২য়)—মধুসূদন দেব ১·০০
২। **ছবি ও পড়া** (২য়)— ঐ ১·০০
৩। **আলোকমালা** (২য়)—অরুণকুমার ১·০০
৪। **টুকটুকে বই** (২য়)
—যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১·০০

দ্রুত পঠন ঃ

রঙ মশাল—আরতি বসু ১·০০

ছড়ার বই ঃ

১। **ছড়ার মেলা**—ননীগোপাল আইচ ১·৫০
২। **মজার ছড়া**—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৫০

গণিত ঃ

১। **আধুনিক গণিত শিক্ষা** (২য়)
—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৫০
২। **নূতন দশমিক গণিত** (২য়)
—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৫০

ইংরাজী ঃ

নিজে শেখ A B C—মধুসূদন দেব ১·৫০

ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঃ

১। **প্রশ্নোত্তরে ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা**
—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৫০
২। **ছবিতে পরিবেশ**— ঐ ১·০০

ইতিহাস ঃ

প্রশ্নোত্তরে ইতিকথা—মধুসূদন দেব ১·৫০

● তৃতীয় শ্রেণী ●

ব্যাকরণ ও রচনা ঃ

১। **প্রশ্নোত্তরে ব্যাকরণ ও রচনা শেখ**
(৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
—সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ২·০০

২। **বুনিয়াদী ব্যাকরণ ও রচনা**
(৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী)
—মধুসূদন দেব ১·৮০

গণিত ঃ

নূতন সিলেবাসের গণিত শিক্ষা
(৩য়)—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৫০

স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঃ

১। **প্রশ্নোত্তরে স্বাস্থ্য ও সমাজ** (২য়)
—অরুণ দেব ১·৫০

২। **ছবিতে স্বাস্থ্য ও সমাজ** (২য়)
—অরুণ দেব ১·৩০

ইংরাজী ঃ

১। **Peacock Word-Book**
(III & IV)—M. S. Dev ১·৮০

২। **New Pattern Grammar, Translation & Word-Book**
—M. S. Dev ১·০০

ছবি আঁক ঃ

নিজে ড্রইং শেখ (১ম ভাগ)
—প্রভাত কর্মকার ১·৫০

প্রশ্নোত্তর ঃ

ছাত্রসাথী
—মধুসূদন দেব ৩·৫০

● চতুর্থ শ্রেণী ●

গণিত ঃ

নূতন সিলেবাসের গণিত শিক্ষা
(৪র্থ ভাগ)—হরেকৃষ্ণ দাস ১·৭৫

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার সহায় ঃ

অভিনব ছাত্র-সুহৃদ (১ম)
—মধুসূদন দেব ৫·০০

● পঞ্চম শ্রেণী ●

ব্যাকরণ ও রচনা ঃ

আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
—মধুসূদন দেব ২·৮০

গণিত ঃ

নূতন সিলেবাসের গণিত শিক্ষা
(৫ম ভাগ)—হরেকৃষ্ণ দাস ২·০০

হিন্দী ঃ

হিন্দী সহজ পাঠ (অনুমোদিত)
—অরুণকুমার ১·০০

Eng. Supp. Reader :

Peacock Supplementary Reader
—S. K. Sen ১·২০

Eng. Gram. & Comp. :

Peacock English Companion
—S. K. Sen ২·৫০

ছবি আঁকা ঃ

নিজে ড্রইং শেখ (২য় ভাগ)
—প্রভাত কর্মকার ১·৫০

প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রশ্নোত্তরিকা
—মধুসূদন দেব ৫·০০

* শিক্ষকদের জন্য বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

শিশু উপন্যাস

নূতন আলো
পরেশ সেনগুপ্ত
মূল্য—১·০০

লব-কুশ
আরতি ঘোষ
মূল্য—১·০০

পরাজিত প্রভারেষ্ট
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
মূল্য—১·২৫

অপরূপ কথা
সুনির্ম্মল বসু
মূল্য—১·২৫

হারানো দিন
শচীন মজুমদার
মূল্য—১·২৫

ছোটদের গল্প
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মূল্য—১·০০

সোনার কবচ
বঙ্কিম সেন
মূল্য—১·০০

ঘূর্ণিপাকে
অখিল নিয়োগী (স্বপনকুমার)
মূল্য—১·২৫

বোমার ভয়ে বার্মা ত্যাগ
মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
মূল্য—১·২৫

পূজার মেলা
যামিনী সোম
মূল্য—১·২৫

অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও রোমাঞ্চকর গল্প

প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ
হেমেন্দ্রকুমার রায়
মূল্য—১·২৫

দেশ বিদেশের হীরে জহরৎ
খগেন্দ্রনাথ মিত্র
মূল্য—১·২৫

প্রলয়ের পর
সুবোধচন্দ্র মজুমদার
মূল্য—১·২৫

বাহাদুর
যজ্ঞেশ্বর রায়
মূল্য—১·২৫

চম্বলের দস্যু সর্দার
উমাশঙ্কর হালদার
মূল্য—১·৫০

অজানা দেশে
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মূল্য—১·৫০

৪১ খানি পূজা বার্ষিকী

প্রত্যেকখানি চার টাকা

ছোটদের চয়নিকা ঝলমল
ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন
আজব বই শিশু-গল্পিকা
সোনার কাঠি
যাদুঘর চিত্রদীপ মায়ামুকুর
সোনালী ফসল
মধুমালা রূপরেখা বর্ষমঙ্গল
আলপনা রাঙারাখী
নবারুণ অঞ্জলি
আবাহন উদয়ন
অভিষেক পরশমণি
বসুধারা ইন্দ্রধনু দেবালয়
জয়যাত্রা নব পত্রিকা
ছোটদের মাধুকরী

প্রত্যেকখানি পাঁচ টাকা

অপরাজিতা দেব দেউল
অপরূপা শারদীয়া শ্যামলী
অলকনন্দা উত্তরায়ণ

প্রত্যেকখানি ছয় টাকা

নীহারিকা অরুণাচল
বেণুবীণা ইন্দ্রনীল শুকসারী

মণিহার ··· ৮·০০
উদ্বোধন ··· ৮·০০

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯
অসংখ্য বই চিঠি লিখলে বিনা মূল্যে পুস্তক-তালিকা পাঠান হয়। B—4

আশুতোষ দেব প্রণীত

নবপর্যায় সংস্করণ

গণিতাংশের সমাধান সংবলিত

কিশলয়-বোধিকা

প্রথম ভাগ কিশলয়-বোধিকা (তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য)

দ্বিতীয় ভাগ কিশলয়-বোধিকা (চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

তৃতীয় ভাগ কিশলয়-বোধিকা (পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)

Complete Key to

PEACOCK ENGLISH

PRIMER AND READERS

Notes on

The Peacock English Primer

(for Class III)

The Peacock English Readers

Book I (for Class IV)

The Peacock English Readers

Book II (for Class V)

মহেন্দ্রলাল দেব প্রণীত

ছাত্রসাথী (তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর) মূল্য—৩.৫০

অভিনব ছাত্র-সুহৃদ্ (চতুর্থ শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর) মূল্য—৫.০০

প্রশ্নোত্তরিকা (পঞ্চম শ্রেণীর প্রশ্নোত্তর) মূল্য—৫.০০

ছাত্র-সুহৃদ্—২য় (ষষ্ঠ শ্রেণী) (নূতন সংস্করণ) মূল্য—৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর ঃঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯ B—5